

সপ্তবর্ণা

দাখিল
সপ্তম শ্রেণি

সপ্তবর্ণা

সপ্তবর্ণা



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ
থেকে দাখিল সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলুপে নির্ধারিত

সপ্তবর্ণ
দাখিল
সপ্তম শ্রেণি

সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক
অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী
অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ
অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান
অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক
অধ্যাপক শ্যামলী আকবর
অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর
ড. সরকার আবদুল মান্নান
ড. শোয়াইব জিবরান
শামীম জাহান আহসান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১১

১ম পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

২য় পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৬

পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

শোনা, বলা, পড়া ও লেখা'র দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলা সন্তুষ্ণা শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটির অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়া গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জীবন ও জগতের বিচিত্র বিষয়ে কৌতুহলী হবে, পাঠ্যভ্যাসে আগ্রহ দেখাবে, পঠিত বিষয়ের মর্ম অনুধাবন এবং চিন্তন দক্ষতা ও রসঘহণের যোগ্যতা অর্জনে সক্ষমতা অর্জন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তক মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করে দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রবর্তন করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশান্তি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গদ্য		
১. কাবুলিওয়ালা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
২. লখার একুশে	আবুবকর সিদ্দিক	৮
৩. মরহুম-ভাস্কর	হৰীবুঢ়াহ্ বাহার	১৩
৪. শব্দ থেকে কবিতা	হুমায়ুন আজাদ	১৮
৫. হ্যারত আবদুল কাদির জিলানি (র.)	সংকলিত	২৩
৬. পিতৃপুরুষের গল্প	হারুণ হাবীব	৩০
৭. ছবির রং	হাশেম খান	৩৬
৮. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	সেলিনা হোসেন	৪১
৯. সেই ছেলেটি	মামুনুর রশীদ	৪৬
১০. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসভা	এ. কে. শেরাম	৫২

কবিতা

১. নতুন দেশ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৮
২. কুলি-মজুর	কাজী নজরুল ইসলাম	৬২
৩. আমার বাড়ি	জসীম উদ্দীন	৬৬
৪. শোন একটি মুজিবরের থেকে	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	৭০
৫. সবার আমি ছাত্র	সুনির্মল বসু	৭৪
৬. শ্রাবণে	সুকুমার রায়	৭৮
৭. গরবিনী মা-জননী	সিকান্দার আবু জাফর	৮১
৮. সাম্য	সুফিয়া কামাল	৮৬
৯. কোরানের বাণী	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৮৯
১০. এই অক্ষরে	মহাদেব সাহা	৯৩

কাবুলিওয়ালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোট যেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না।

সকালবেলোয় আমার নভেলের সঞ্জদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, “বাবা, রামদয়াল দরোয়ান কাককে কৌয়া বলছিল, সে কিছু জানে না। না ?”

সে আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই ইঁট এবং হাত লইয়া অভিন্নত উচ্চারণে আগড়ম-বাগড়ম খেপিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাত মিনি আগড়ম-বাগড়ম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চিন্কার করিয়া ডাকিতে লাগিল, “কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা।”

ময়লা চিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে, হাতে গোটা দুই-চার আঙুরের বাস্তি, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা পথ দিয়া যাইতেছিল — তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারহের কিরণ ভাবেদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে উর্ধবশাসে ডাকাডাকি আরস্ত করিয়া দিল।

মিনির চিৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল, অমনি সে উর্ধবশাসে অস্তঃপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অঙ্গ বিশ্঵াসের মতো ছিল যে, ঐ ঝুলিটার ভিতর সন্ধান করিলে তাহার মতো দুটো-চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অস্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম — সে আমার গা যেঁষিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে কিসমিস খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।

কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলায় বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুইতাতি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অর্ণগল কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম-কিসমিসে পরিপূর্ণ।

সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেন্স্টাবাদাম ঘূষ দিয়া মিনির ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম, এই দুটি বন্ধুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে — যথা, রহমতকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, “কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার ও ঝুলির ভিতর কী।”

রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উন্নত করিত, “হাঁতি।”

উহাদের মধ্যে আরো-একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমত মিনিকে বলিত, “যোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি কখনু যাবে না!”

কথাটার একটা কোনো জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাববিরুদ্ধ — সে উল্টিয়া জিজ্ঞাসা করিত, “তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে ?”

রহমত কাল্পনিক শ্বশুরের প্রতি প্রকাণ মোটা মুষ্টি আস্ফালন করিয়া বলিত, “হামি সসুরকে মারবে।”

শুনিয়া মিনি শ্বশুর-নামক কোনো-এক অপরিচিত জীবের দুরবঙ্গ কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

মিনির মা অত্যন্ত শক্তিত স্বভাবের লোক। রহমত কাবুলিওয়ালা সংশ্লেষণে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন।

একদিন সকালে আমার ছোট ঘরে বসিয়া প্রক্রিটি সংশোধন করিতেছি। এমন সময় রাত্তায় ভারি একটা গোল শুনা গেল।

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমতকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে — তাহার পশ্চাতে কৌতূহলী ছেলের দল চলিয়াছে। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কী।

কিয়দংশ তাহার কাছে, কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিৎ ধারিত — মিথ্যাপূর্বক সেই দেনা সে অঙ্গীকার করে এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমত তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।

রহমত সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানারূপ অশ্বাব্য গালি দিতেছে, এমন সময় ‘কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা’ করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মুখ মুহূর্তের মধ্যে কৌতুকহাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি শুগুরবাড়ির যাবে?”

রহমত হাসিয়া কহিল, “সিখানেই যাচ্ছে।”

সাংঘাতিক আঘাত করা অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গেলাম।

কত বৎসর কাটিয়া গেল। আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে না হইতে সানাই বাজিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।

আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমত আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই, তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই। অবশ্যে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।

কহিলাম, “কী রে রহমত, কবে আসিলি।”

সে কহিল, “কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।”

আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়।

আমি তাহাকে কহিলাম, “আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি কিছু ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও।”

কথাটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাত চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশ্যে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, “খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না?”

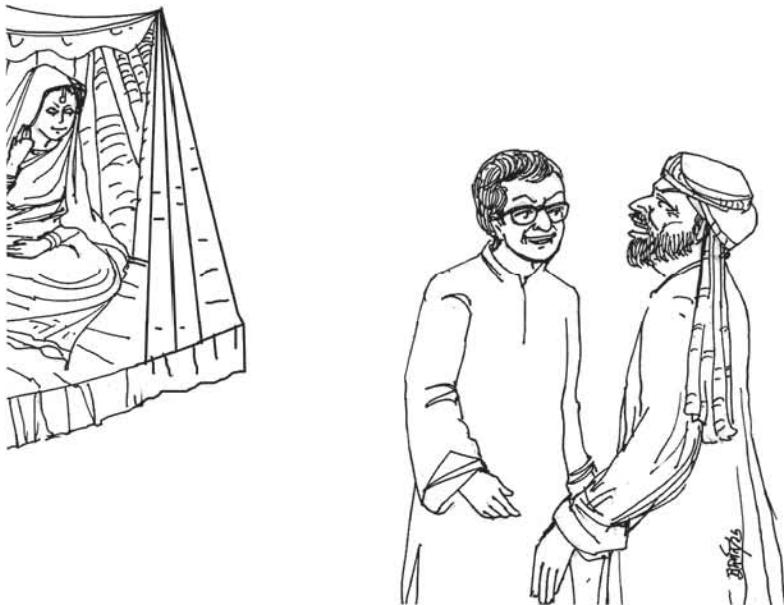
আমি কহিলাম, “আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারও সহিত দেখা হইতে পারিবে না।”

সে যেন কিছু ক্ষুঁগ হইল। স্তৰভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তার পরে ‘বাবু সেলাম’ বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।

আমার মনে কেমন একটু ব্যথা বোধ হইল। মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময়ে দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।

কাছে আসিয়া কহিল, “এই আঙ্গুর এবং কিঞ্চিৎ কিসমিস বাদাম খোঁখীর জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।”

আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাত আমার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, “আপনার বহুৎ দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে — আমাকে পয়সা দিবেন না। বাবু, তোমার যেমন একটি লড়কি আছে, তেমনি দেশে আমারও



একটি সড়কি আছে। আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার ধোঁধীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওদা করিতে আসি না।”

এই বলিয়া সে আগমার মন্ত্র টি঳া জামাটার ডিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে এক টুকরা মরলা কাগজ বাহির করিল। বহু স্বত্ত্বে তাঙ্গ খুলিয়া দৃই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

দেখিলাম, কাগজের উপর একটি ছোট হাতের ছাপ। ফটোআফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খালিকটা তুষা মাঝাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কল্যার এই স্মরণচিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমত প্রতিবৎসর কলিকাতার রাণাঘাট মেওয়া বেচিতে আসে।

দেখিয়া আমার চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাত তাহাকে অভঃপুর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অভঃপুরে ইহাতে অনেক আগম্ভি উঠিয়াছিল। কিন্তু আমি কিছুতে কর্পোর করিলাম না। রাণাচেলি-পরা কশালে-চন্দন-আঁকা বধুবেশিনী মিনি সলজজভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঢ়াইল।

তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়ালা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তাহাদের পুরাতন আলাপ জয়াইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল, “ধোঁধী, তোমি সমুরবাড়ি যাবিস ?”

কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্চাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাত স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তাহার মেঝেটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড় হইয়াছে।

আমি একথানি নেটি লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, “রহমত, তুমি দেশে তোমার যেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের যিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হটক।”

শব্দার্থ ও টীকা

কাবুল	— আফগানিস্তানের রাজধানী।
কাবুলিওয়ালা	— কাবুলের অধিবাসী। অতীতে কাবুলের অনেক লোক নানা কাজ নিয়ে এ দেশে নিয়মিত যাতায়াত করত।
দণ্ড	— মুহূর্ত।
নঙ্গেল	— উপন্যাস।
সপ্তদশ	— সতের।
পরিচ্ছেদ	— অধ্যায়।
পার্শ্বে	— পাশে
কন্যারত্ন	— কন্যাকে আদর করে রত্নের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
ভাবোদয়	— ভাবের উদয়। মনে চিন্তা বা ভাবনা জাগা।
উর্ধ্বশাস্ত্রে	— অতি দ্রুতবেগে।
অঙ্গপুর	— বাঢ়ির ভিতরের অংশ।
অভিপ্রায়	— ইচ্ছা।
খোবানি	— বাদাম জাতীয় ফল।
দুইতা	— কন্যা।
দ্বার	— দরজা।
সমীপস্থ	— নিকটে, কাছে।
অনর্গল	— অবিরাম, অনবরত।
সহাস্যমুখ	— হাসি মুখ।
পথওবর্ষীয়	— পাঁচ বছর বয়সী।
খেঁথী	— কাবুলিওয়ালা কর্তৃক ‘খুকি’ শব্দের অশুন্দ উচ্চারণ।
স্বতাবিরক্ত	— স্বতাবের বিপরীত।
মুষ্টি আক্ষফলন	— জোরে মুষ্টি নাড়ানো।
নিঃসংশয়	— শক্তাহীন।
কিঞ্চিৎ	— অল্প।
ধারিত	— ঋগ্যান্ত।
প্রযুক্তি	— আনন্দিত।
লড়কি	— মেয়ে।

পাঠের উদ্দেশ্য

বাংলা ভাষার সাধু রীতির সাহিত্য পাঠে অনুপ্রাণিত করা।

পাঠ-পরিচিতি

ভিন্ন সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠলেও মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ ভালোবাসার অনুভূতি অনেকাংশেই এক। ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আফগানিস্তানের মরু পর্বতের রক্ষ প্রকৃতিতে গড়ে ওঠা একজন পিতা এবং নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার একজন বাঙালি পিতার ভিতরের স্নেহপ্রবণ মনের এক্য সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। দেশকালের সীমারেখা পিতৃহৃদয়ের স্থানাবিক প্রবণতায় কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। যে দেশের বা যে সময়ের বা যে সংস্কৃতিরই মানুষ হোক না কেন পিতা সব সময়ই তার সন্তানকে একই রকমভাবে ভালোবাসেন। সন্তানের মঙ্গল-চিন্তা সব পিতারই সহজাত আকাঙ্ক্ষা। ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বের সকল পিতার পিতৃত্বের সার্বজনীন ও চিরস্মৃত রূপকে উন্মোচিত করেছেন।

লেখক-পরিচিতি

এশীয়দের মধ্যে যিনি প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বসভায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি হলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ৭ই মে (২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষুলে নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর হয় নি। সতেরো বছর বয়সে বিলেতে ব্যারিস্টার পড়তে গিয়েছিলেন। সে-পড়া শেষ না হতেই দেশে ফিরে আসেন তিনি। কিন্তু শিক্ষাও সাধনার একক অবদানে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এত সমৃদ্ধ করেছেন যার কোনো তুলনা নেই। কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সংগীত-সাহিত্যের সকল শাখা তাঁর আশ্চর্য অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ এবং চিত্রকলাতেও তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন।

অনন্যসাধারণ তাঁর প্রতিভা। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, সুরকার, গীতিকার, নাট্যকার, নাট্যপ্রযোজক এবং অভিনেতা। শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তিনি শিক্ষায় নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের একটি দেশপ্রেমমূলক গান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। রবীন্দ্রনাথের লেখা গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর বিভিন্ন রচনা সংকলিত হয়েছে ‘কেশোরক’ নামে একটি সংকলনে।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

- সাধু রীতিতে লেখা ১০টি গল্পের তালিকা তৈরি কর (একক কাজ)।
- পাঠ্য বইয়ের ১টি করে সাধু ও চলিতরীতির গদ্য অবলম্বনে রীতি দুটোর ৫টি পার্থক্য বের কর। (দলীয় কাজ)।
- সাধু রীতির একটি অনুচ্ছেদ চলিত রীতিতে রূপান্তর কর।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পে শক্তি স্বভাবের মানুষটি কে ?

- | | |
|-------------|---------------|
| ক. রহমত | খ. মিনির মা |
| গ. রামদয়াল | ঘ. মিনির বাবা |

২. মিনির বাবার মনে একটু ব্যথা বোধ হয়েছিল কেন ?

- ক. মিনি শুশুর বাড়ি যাচ্ছে বলে
- খ. রহমতকে কারাগারে যেতে দেখে
- গ. মিনির সাথে রহমতের দেখা না হওয়ায়
- ঘ. রহমতের মেয়ের কথা ভেবে

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

ফাতেমা চৌধুরী অফিসে যাওয়ার পথে প্রায়ই একটি পথশিশুকে রাস্তায় শুয়ে থাকতে দেখেন। একদিন তিনি ছেলেটিকে কিছু খাবার দিতে চাইলে সে ভয়ে পালিয়ে যায়। কয়েকদিনের চেষ্টায় ছেলেটি তার সাথে নানা গল্পে যেতে উঠে। এখন প্রায়দিনই তিনি ছেলেটির জন্য বাসায় তৈরি খাবার নিয়ে আসেন। তবে কখনো তার দেখা না পেলে খুব চিন্তিত হয়ে ওঠেন।

৩. উদ্দীপকের ফাতেমা চৌধুরীর সাথে ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পের কোন চরিত্রের মিল আছে ?

- | | |
|---------|-------------|
| ক. রহমত | খ. রামদয়াল |
| গ. লেখক | ঘ. মিনি |

৪. উদ্দীপকে ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পের কোন দিকটি ফুটে ওঠেছে ?

- i. সন্তান বাংসল্য
- ii. সহর্মিতা
- iii. সহযোগিতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১ : নতুন দারোয়ান সামাদ মিয়ার সাথে ছেলের বেশি ভাব-বন্ধুত্ব কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না আবীরের মা। তিনি স্বামীকে বোঝান - বিভিন্ন ফন্দি করে অনেক মানুষ এখন অন্যের বাচ্চা চুরি করে। সামাদ মিয়াও তো একদিন তেমন কিছু করে বসতে পারে।

উদ্দীপক-২ : বাবো বছর আগের ছেট্টি আবীর আজ কলেজ থেকে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় হাসপাতালে রক্তের জন্য বাবা-মা বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করছেন। খবর পেয়ে সামাদ মিয়া ছুটে এসে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলে - ‘সাহেব, আবীর বাবার জন্য আমার সব রক্ত নেন, আমার নিজের ছেলেরে হারাইছি, ওরে হারাইলে আমি বাঁচুম না।’

- ক. কাবুলিওয়ালার মলিন কাগজটিতে কী ছিল?
- খ. রহমতকে কারাবরণ করতে হয়েছিল কেন?
- গ. উদ্দীপক-১ অংশে ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে - ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘উদ্দীপকের সামাদ মিয়া যেন কাবুলিওয়ালা গল্পের মূল ভাবকেই ধারণ করে আছে’ - বিশ্লেষণ কর।

লখার একুশে আবুবকর সিদ্ধিক



লখার রাতের বিছানা ফুটপাথের কঠিন শান। এই শান দিনের বেলায় রোদে পুড়ে গরম হয়। রাতে হিম লেগে বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়। ঠাণ্ডা শানে শুষ্ঠে লখার বুকে কাশি বসে। গায়ে জ্বর ওঠে।

বাপকে লখা দেখে নি। চেনে না। মা তার ত্যানাখানি পরে দিনভর কেঁদে-কেঁদে ভিখ মেঝে ফেরে। লখার দিন কাটে শশি খেলে, হেঁড়া কাগজ কুড়িরে, বছন্দের সঙ্গে মারামারি করে আর খাবারের দোকানের এঁটোপাতা চেটে। রাতে মাঘের পাশে লখা খিদের কষ্ট ভুলে যায়।

এই লখা, ছায়া দেখলে বুক কাঁপে যাব, সে আজ ভোররাতে মাঘের পাশ থেকে উঠে পড়ল। মা মুখ হাঁ করে ঘুমুচ্ছে। লখা চূপি চূপি পা ফেলে হারিয়ে গেল ঘোয়া-ঘোয়া কুয়াশার মধ্যে।

খানিকটা এগিয়ে উঁচু রেললাইন যেন দুটো য়া সাপ। পাশাপাশি শুয়ে আছে চৃপচাপ। লখা ইটের টুকরো দিয়ে ইল্পাতের লাইনে টুক-টুক টুকে তার উপর কান পাতল। হ্যাঁ, শব্দ শোনা যাচ্ছে। যেন গানের সুরলহরি বরে যাচ্ছে কানের ভিতর দিয়ে। লখা ভারি মজার দুষ্ট ছেলে। গানের মজা ফুরিয়ে গেলে পর এক লাফে লাইন পেরিয়ে ওগারে পৌছে গেল। সেখানে মন্ত নিচু খাদ। তার ভিতর গড়িরে পড়লে হাত-পা ভাঙবে নির্ধাত। খুব সাবধানে খাদ পেরিয়ে ওপারের ডাঙায় উঠে এলো সে। ডাঙাটা আসলে বনজঙ্গলে অঙ্ককার। বিঁরি পোকা ডাকছে আর খেড়ে খেড়ে গাছের বাঁকড়া ছায়া মাথা নেড়ে নেড়ে ভয় দেখাচ্ছে লখাকে।

খচ করে কাঁটা চুকে গেল বাঁ পায়ে। কীসের কাঁটা? হবে হয়তো বাবলা-টাবলাৰ। লখা উবু হয়ে বসে কাঁটাটা খসিয়ে দূৰে ছুড়ে ফেলে দিলো। কিন্তু বিষ তো যাব না। কী অসহ্য যত্নগা। আঁ আঁ বলে কেঁদে দিলো লখা। কিন্তু কাঁদলে তো চলবে না। সময় নেই আৱ। তাকে যে যেতেই হবে। আবছা অঙ্ককার। ফিনফিনে ঠাণ্ডা। গাছের পাতা বেয়ে শিলি

গড়িয়ে পড়ছে। খুক খুক করে কাশি আসছে লখার। খালি গা শিশিরে ভিজে শীত লাগছে। একটা ছ্যাচড়া ডাল লখার হাফপ্যান্টটা টেনে ধরেছে পিছন দিক দিয়ে। প্যান্ট আধখসা অবস্থায় দৌড়াতে লাগল সে।

একটা খেকশেয়াল বুঝি তাকিয়ে দেখছিল তাকে। দেখুক গে। এখন ভয় ভয় করলে দেরি হয়ে যাবে। কাজেই এবার চোখ-কান বুজে দৌড় শুরু করতে হলো তাকে। আর শেষটায় সেই অঙ্গুত গাছটার নিচে পৌছে গেল লখা, যার ডালে ডালে রক্তের মতো টুকুটুকে লাল ফুল। দিনের বেলায় রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে থোকা থোকা ফুলের লাল ঝুঁটির পানে তাকিয়ে থাকে সে। এখন ওই উপরের এক থোকা ফুল তার পেড়ে আনা চাই।

হাতের মুঠো পাকিয়ে মনটাকে শক্ত করে নিল লখা। তারপর চড় চড় করে গাছে উঠে গেল। একেবারে কাঠবেড়ালির বাচ্চা যেন। মগডালের কাছাকাছি এসে কয়েকটা তুলোমিঠের মতো বড় বড় থোকা পেয়ে গেল সে। শিশিরে ভেজা তুলভূলে। তা হোক, তোমরা এখন আমার। নাও সব টুপটাপ নেমে এসো তো আমার মুঠোর মধ্যে। কষ্ট লাগছে। আহা! কীসের কষ্ট? এই তো একটু পরে আমি তোমাদের এমন একটা উঁচু জায়গায় নিয়ে রেখে দেবো, যেখান অবধি তোমরা এই গাছের মগডালে কোনোদিন উঠতে পারবে না। এসো, এসো, লক্ষ্মীসোনারা সব নেমে এসো তো।

ফুল নিয়ে যখন মাটিতে নেমে এলো লখা, তখন সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে তার। কনুই ও বুকে চট্টচট্টে ঠাণ্ডা। হাত দিয়ে টের পায়, টাটকা রক্ত। গাছের ডালপালা কাঁটায় ভর্তি। গা-হাত-পা ছিঁড়ে গেছে আঁচড় লেগে। তাতে কী! জিতে গেছি আমি। গর্বে বুক ফুলে ওঠে লখার।

সেদিন সকাল ছিল বড় আশ্র্য সুন্দর। আকাশে হালকা কুয়াশা। অঞ্জ অঞ্জ শীত। আর দক্ষিণের সামান্য বাতাস। পথে পথে মিছিলের ঢল নেমেছে। শত শত মানুষ। হাতে ফুলের গুচ্ছ। ঠোটে প্রভাতফেরির গান। ধীর পায়ে শহিদ মিনারের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই ভিড়ের মধ্যে ক্ষুদে টোকাই লখাকে ঠিকই দেখা যাচ্ছে। তাকে চিনতে কষ্ট হয় না। কারণ মিছিলের সবার গায়ে চাঁদর, কোট, সোয়েটার। শুধু তার গা খোলা উদাম, গাঢ় কালো। হাত উপচে পড়ছে রক্তলাল ফুলের গুচ্ছ। মিছিলে পা মিলিয়ে সেও চলেছে শহিদ মিনারে ফুল দিতে। সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গেয়ে চলেছে — আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেরুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি? কিন্তু তার গলা দিয়ে কথা তো ফোটে না, শুধু শব্দ হয় আঁ আঁ আঁ আঁ।

আসলে কথা ফুটবে কী করে? লখা যে জ্বালোবা। বাংলা বুলি তার মুখে ফুটতে পায় না। সে মনে মনে বলে — অ আ ক থ। বাইরে শব্দ হয় — আঁ আঁ আঁ আঁ।

শব্দার্থ ও টীকা

শান	-	পাথর। এখানে কংক্রিটে তৈরি ফুটপাথ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে।
ত্যানাখানি	-	পুরনো ছেঁড়া কাপড়।
ভিখ	-	ভিক্ষা, খয়রাত।
মেঞ্চ	-	চেয়ে।
গুলি খেলা	-	মার্বেল দিয়ে খেলা।
ছায়া দেখলে বুক কাঁপে যার	-	যে নিজের ছায়াকেও ভয় পায়। খুব ভিতু।

- বিষ**
- যে পদাৰ্থ শৰীৰ তুকলে যে কোনো প্ৰাণী অসুস্থ হয়, কখনো কখনো মাৰাও যায়। এখনে পথে কাঁটা ফোটাৰ জন্য ‘ব্যথা’ অৰ্থে ব্যবহাৰ কৱা হয়েছে।
- তুলোমিঠে**
- তুলোৰ মতো দেখতে মিষ্টি খাদ্য বিশেষ। একে ‘হাওয়াই মিঠাই’-ও বলে।
- মগডাল**
- গাছেৰ সবচেয়ে উঁচু ডাল।
- গাঢ়**
- ঘন।
- প্ৰভাত ফেরি**
- ভোৱেলো দল বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় গান গেয়ে সবাইকে জাগিয়ে তোলাৰ অনুষ্ঠান বিশেষ। কিন্তু বাংলাদেশে প্ৰভাতফেরি একটি বিশেষ অৰ্থ বহন কৱে। এটি একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্ৰভাষা হিসেবে ব্যবহাৰ কৱাৰ দাবিতে আন্দোলন হয়। তখন ছিল পাকিস্তান। তখনকাৰ সৱকাৰ সে-দাবি মানে না। তখন ছাত্ৰ-জনতা তীব্ৰ আন্দোলন কৱতে থাকে। সেই আন্দোলন চৰমে ওঠে ১৯৫২ সালে। ১৯৫২ সালেৰ ২১শে ফেব্ৰুয়াৰি ঢাকায় ছাত্ৰ-জনতাৰ মিছিলে তৎকালীন সৱকাৰেৰ পুলিশ গুলি চালায়। তাতে শহিদ হন রফিক, সালাম, বৱকত, জববাৰসহ আৱাও অনেকে। তাৰই স্মৰণে প্ৰতিবছৰ ২১শে ফেব্ৰুয়াৰি প্ৰভাতফেরি কৱা হয়। প্ৰভাতফেরিৰ সময় সকলেৰ কষ্টে থাকে আবদুল গাফ্ফার চৌধুৱী রচিত এবং শহিদ আলতাফ মাহমুদেৰ সুৱ কৱা গান ‘আমাৰ ভাইয়েৰ রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্ৰুয়াৰি, আমি কি ভুলিতে পাৰি’।
- শহিদ মিনার**
- শহিদেৱ স্মৃতি রক্ষাৰ জন্য নিৰ্মিত মিনার। ভাষা-আন্দোলনেৰ শহিদেৱ স্মৰণে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেৰ সন্নিকটে আমাদেৱ কেন্দ্ৰীয় শহিদ মিনার অবস্থিত।

পাঠেৰ উদ্দেশ্য

ভাষা-আন্দোলনেৰ চেতনায় শিক্ষার্থীদেৱ উদ্বৃদ্ধ কৱা।

পাঠ-পৱিচিতি

গল্পটিতে একুশে ফেব্ৰুয়াৰিৰ অবিনাশী প্ৰভাৱেৰ কথা বলা হয়েছে। অতি সাধাৱণ এক কিশোৱ লখা। কথা বলতে পাৱে না সে। কিন্তু তাতে কীই-বা আসে যায়। লখা উঁচু ডালে উঠে লাল ফুল সংগ্ৰহ কৱে শহিদ মিনারে যায় শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৱতে। কথা বলতে না পাৱলৈও তাৰ মুখ দিয়ে আঁ আঁ আঁ ধৰনিৰ মধ্য দিয়েই বেৱিয়ে আসে বাঞ্ছিলিৰ গৰ্বেৰ উচ্চাবণ — ‘আমাৰ ভাইয়েৰ রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্ৰুয়াৰি’।

লেখক-পৱিচিতি

বাংলাদেশেৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুবকৰ সিদ্দিক ১৯৩৬ খ্ৰিস্টাব্দে বাগেৰহাট জেলায় জন্মগ্ৰহণ কৱেন। তাঁৰ রচিত উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ হলো : ‘জলৱাল্পী’, ‘খৰাদাহ’, ‘একাভৱেৰ হৃদয়ভস্ম’, ‘বাৰুদ পোড়া প্ৰহৱ’ ইত্যাদি।

କର୍ମ-ଆନୁଶୀଳନ

- ক. শহিদ দিবসের উপর শিক্ষার্থীরা আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে ।
খ. শহিদ দিবস উপলক্ষে ছত্রা, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটিকা ইত্যাদির সমষ্টিয়ে দেয়ালিকা প্রকাশ করবে ।

ନୟନା ଧର୍ମ

ବନ୍ଦନାରୀଚନ୍ଦ୍ର

উদ্বীপকটি পদ্ধে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাবার সাথে প্রভাতফেরিতে এসেছে দিপু। ওর হাতে একটা টকটকে লাল গোপাল। ওর কষ্টে গানের সুর ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো’। ও লাল গোলাপটিকে শহিদ মিনারের সবচেয়ে উচ্চ সিঁড়িতে রাখতে চায়।

৩. লখা ও দিপুর মধ্যে যে বিষয়ে মিল আছে তা হলো —

 - ক. শহিদ মিনারে আসা মানুষ দেখার ইচ্ছা
 - খ. শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর আবেগ
 - গ. প্রতিবন্ধকতা দূর করার অদম্য বাসনা
 - ঘ. শহিদ দিবসের গান গাওয়ার আগ্রহ

৪. দিপু ও লখা দুজনেই শহিদ দিবস উদযাপন করেছিল; তবুও লখাই প্রমাণ করেছে যে —

 - i. ভালোবাসার অনুভূতি প্রতিবন্ধকতার চেয়ে শক্তিশালী
 - ii. আত্মবিশ্বাস দ্বারা বাধাকে অতিক্রম করা যায়
 - iii. শিশুরা অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. ইশতিয়াক এবার বৃত্তি নিয়ে জাপানে লেখাপড়া করতে চলে আসায় শহিদ দিবস উদযাপন করতে পারবে না। অথচ প্রতিবছর সে প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করত — বক্তৃতা, আবৃত্তি, আলোচনা শুনত, সে-কথা মনে করে তার চোখ জলে ভরে আসে। মনে মনে কিছু করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করে। অতঃপর ইশতিয়াক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও এর ইতিহাস সহপাঠীদের কাছে তুলে ধরার পরিকল্পনা করে।
- ক. লখা রাতে কোথায় ঘুমায়?
- খ. ‘জিতে গেছি আমি। গর্বে বুক ফুলে ওঠে লখার’। — কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
- গ. ‘লখা ও ইশতিয়াক দুজনের কাছে শহিদ দিবস ভিল্ল আঙিকে এসেছে।’ — ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘ইশতিয়াকের শহিদ দিবস উদ্যাপনের আকাঙ্ক্ষা লখার শহিদ দিবস উদ্যাপনের আকাঙ্ক্ষারই অতিফলন।’ — বিশ্লেষণ কর।

ମରୁ-ଭାସ୍କର ହୌବୁଲାହ ବାହାର



ଯେସବ ମହାପୁରୁଷେର ଆବିର୍ଜନୀବେ ପୃଥିବୀ ଧନ୍ୟ ହସେଇଛେ – ମାନୁଷେର ଜୀବନେ ସ୍ଥାରା ଏଲେଜେନ ସୌର୍ତ୍ତବ, ଫୁଟିଯେହେନ ଲାବଣ୍ୟ, ମରୁ-ଭାସ୍କର ହସରତ ମୁହାୟଦ ମୋଷ୍ଟଫା (ସ.) ତାଁଦେର ମଧ୍ୟେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତ ।

ହସରତ ମୁହାୟଦ (ସ.)-ଏର ଜୀବନ ଆଲୋଚନା କରତେ ଗିଯେ ସକଳେର ଆଗେ ଆମାଦେର ଚୋଖେ ପଡ଼େ ତାଁର ଐତିହାସିକତା । ହସରତେର ଜୀବନେର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟନା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଝୁଟିଲାଟି ବ୍ୟବରଣ ଯେତାବେ ରଙ୍ଗ କରା ହସେଇ, ସତ୍ୟର କଟିପାଥରେ ସବେ ଯେତାବେ ଘାଚାଇ କରା ହସେଇ, ପୃଥିବୀର କୋଳେ ମହାପୁରୁଷେର ବେଳାୟ ତା କରା ହସନି ।

ଆରବେର ଲୋକେର ଶ୍ରୁତିଶକ୍ତି ଛିଲ ସତିୟ ଅସାଧାରଣ । ବିରାଟ ବିରାଟ କାବ୍ୟରୁ ସହଜେଇ ତାରା ମୁଖସ୍ତ କରେ ଫେଲତ । ଆରବି ସାହିତ୍ୟେର ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା କରଲେ ଦେଖା ଯାଇ, ମୁଖସ୍ତ ନା କରେ କୋଳେ କିଛୁ ଲିଖେ ରାଖା ଆରବିରା ଲାଜାର କଥା ବଲେ ମନେ କରତ । ସାହାବିରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାଦିସଙ୍କରା ଅନେକେଇ ହାଜାର ହାଜାର ହାଦିସ ମୁଖସ୍ତ କରେ ରାଖିତେନ ।

ହସରତ ମୋଷ୍ଟଫା (ସ.) ମାନବତାର ଗୌରବ । ଆଜ୍ଞାହୁର ନବି ହସ୍ତା ସନ୍ତ୍ରେ ତିନି ନିଜେକେ ସାଧାରଣ ମାନୁଷଙ୍କ ମନେ କରାନେ ଏବଂ ସେଭାବେଇ ତିନି ଜୀବନଯାପନ କରେହେନ । ୬୩ ବର୍ଷରେ କୁନ୍ତ ପରିସର ଜୀବନେ ହସରତକେ କତ ପରିବର୍ତ୍ତନେର ସମ୍ଭ୍ରମୀନ ହତେ ହସେଇ, ଦେଖଲେ ଅବାକ ହତେ ହୁଏ । ସିନି ଛିଲେନ ଏତିମ, ତିନି ହସେଇଲେନ ସାରା ଆରବଭୂମିର ଅବିସଂବାଦିତ ନେତା ।

ହସରତ ସଥିନ ମଦିନାର ଅଧିନାୟକ, ତଥନ ତାଁର ଘରେର ଆସବାବ ଛିଲ – ଏକଥାନା ଖେଜୁର ପାତାର ବିଛାନା ଆର ଏକଟି ପାନିର ସୁରାହି । ଅନେକ ଦିନ ତାଁକେ ଅନାହାରେ ଥାକତେ ହତ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟ ଉନ୍ନେ ଝଲକ ନା ଆଗୁନ ।

ହସରତେର ଚରିତ୍ରେ ସଂମିଶ୍ରଣ ହସେଇଲ କୋମଳ ଆର କଠୋରେର । ବିଶ୍ୱାସେ ସିନି ଛିଲେନ ଅଜ୍ଞେ, ଅକୁତୋଭୟ, ସତ୍ୟ ଓ ସଂଖ୍ୟାମେ ସିନି ବଜ୍ରେ ମତୋ କଠୋର, ପର୍ବତେର ମତୋ ଅଟଳ, ତାଁକେଇ ଆବାର ଦେଖତେ ପାଇ – କୁନ୍ତମେର ଚେଯେଓ କୋମଳ । ବଞ୍ଚି-ବାହାରେ ଜନ୍ୟ ତାଁର ଶ୍ରୀତିର ଅନ୍ତ ନେଇ – ମୁଖ ତାଁର ସବ ସମୟ ହାଶିହାସି, ଛେଲେଖିଲେର ସଙ୍ଗେ ଯେଶେନ ତିନି ଏକେବାରେ ଶିଶୁର ମନ ନିଯେ – ପଥେ ଦେଖା ହଲେ ବାଲକ-ବଞ୍ଚିକେ ତାର ବୁଲବୁଲିର ଖବର ଜିଜେସ କରତେ ତାଁର ଭୁଲ ହୁଯ ନା । ବଞ୍ଚିବିଯୋଗେ

চক্ষু তাঁর অঞ্চলিক হয়। বহু দিন পর দাই-মা হালিমাকে দেখে ‘মা আমার, মা আমার’ বলে তিনি আকুল হয়ে উঠেন। মুক্তাবিজয়ের পর সাফা পর্বতের পাদদেশে বসে হ্যারত বক্তৃতা করছিলেন। একজন লোক তাঁর সামনে এসে ভয়ে কাঁপতে লাগল। হ্যারত অভয় দিয়ে বললেন : ভয় করছ কেন? আমি রাজা নই, কারও মুনিবও নই – এমন মায়ের সন্তান আমি, শুষ্ক খাদাই যাঁর আহার্য।

হ্যারত জীবনে কাউকে কড়া কথা বলেননি – কাউকে অভিসম্পাত দেননি। আনাস নামক এক ভৃত্য দশ বছর হ্যারতের চাকরি করার পর বলেছেন – এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে হ্যারতের মুখে তিনি কড়া কথা শোনেননি। কখনো। মঙ্কায় বা তায়েফে অত্যাচারে জর্জরিত হয়েও হ্যারতের মুখে অভিসম্পাতের বাণী উচ্চারিত হয়নি। বরং তিনি বলেছেন, এদের জ্ঞান দাও প্রভু – এদের ক্ষমা করো।

জগতে সাম্যের প্রতিষ্ঠা মোস্তফা চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও দাস-ব্যবসায়ের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মানবাত্মা যখন গুমরে মরছিল, রাসুলুল্লাহ (স.) তখন প্রচার করেন সাম্যের বাণী।

সমগ্র জীবন দিয়ে তিনি সাম্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। চরম দুরবস্থার হাত থেকে দাসদের পরিত্রাণের জন্যও তিনি কাজ করেছেন। মানুষকে সালাতে আহ্বান করার জন্যে মুয়ায়িন নিযুক্ত করেছেন হাবশি গোলাম হ্যারত বেলালকে।

নারীর অবস্থার পরিবর্তন এনেছেন হ্যারত। নারীর মর্যাদা ছিল তাঁর শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। তাঁর কন্যা হ্যারত ফাতেমা (রা.)-কে কেন্দ্র করে সে যুগে গড়ে উঠেছে নারীত্বের আদর্শ। হ্যারত ঘোষণা করেছেন: বেহেশত মায়ের পায়ের নিচে।

কুসংস্কারকে হ্যারত কোনো দিনই প্রশংস দেননি। একবার হ্যারতের পুত্রের মৃত্যুদিনে সূর্য়হণ দেখা যায়। লোকে বলাবলি করতে থাকে – বুঝি হ্যারতের বিপদে প্রকৃতি শোকাবেশ পরিধান করেছে। তখনি সভা ডেকে হ্যারত এই বাস্তবতাবিরোধী কথার প্রতিবাদ করলেন; বললেন, “আল্লাহর বহু নিদর্শনের মধ্যে দুটি – চন্দ্র ও সূর্য। কাবুর জন্ম বা মৃত্যুতে চন্দ্র – সূর্যে গ্রহণ লাগতে পারে না।”

হ্যারত জ্ঞানের ওপর জোর দিয়েছেন সব সময়। জ্ঞান যেন হারানো উটের মতো – তাকে তিনি খুঁজে বের করতে বলেছেন যেখান থেকেই হোক। আরও বলেছেন তিনি: জ্ঞানসাধকের দোয়াতের কালি শহিদের লহুর চাইতেও পবিত্র।

এইভাবে জ্ঞানের আলোয় মানুষের হৃদয় উজ্জ্বল করার প্রেরণা দিয়ে গেছেন তিনি।

(সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত)

শৰ্দাৰ্থ ও টীকা

- | | |
|-------------|--|
| মরু-ভাস্কর- | মরুভূমিৰ সূর্য। এখানে হ্যারত মুহাম্মদ (স.)-কে বোঝানো হয়েছে। |
| সৌষ্ঠব- | সুগঠন। |
| কষ্টপাথর- | ঘষে সোনা পরীক্ষা করার এক রকম কালো পাথর। |

সুরাহি-	পানির এক রকম পাত্র, সোরাই, জলের কুঁজো।
অকুতোভয়-	যার কোনো কিছুতে ভয় নেই, নিষ্ঠীক।
অভিসম্পাত-	অভিশাপ।
পরিত্রাণ-	যুক্তি।
হাবশি গোলাম-	আবিসিনিয়ায় (বর্তমানে ইথিওপিয়া) জন্মাট্টহণকারী ক্রীতদাস।
লহু-	রক্ত।

পাঠের উদ্দেশ্য

মহামানবদের প্রতি শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা।

পাঠ- পরিচিতি

‘মরহ-ভাক্র’ প্রবন্ধে লেখক মহানবির জীবন ও আদর্শের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন যা আমাদের ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিকতার বিকাশে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে।

হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সেই মহাপুরুষদের মধ্যে একজন যিনি চরিত্রাবান; মানবপ্রেমে, জীবপ্রেমে মহীয়ান। বিপদে ধৈর্যশীলতা, দারিদ্র্যে অচৰ্ঘলতা, শক্তির প্রতি ক্ষমাশীলতার মহৎ দৃষ্টান্তে তাঁর জীবন সমুজ্জ্বল। অনেক মহাপুরুষের জীবন প্রকৃত তথ্যের চেয়ে কান্নানিক নানা তথ্যে ভরা। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনের যত তথ্য পাওয়া যায় সবই ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে স্বীকৃত।

আল্লাহর মহান নবি হওয়া সত্ত্বেও হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন একজন সাধারণ মানুষের মতো। তাই তিনি মানবজাতির গৌরব।

তাঁর ৬৩ বছরের ঘটনাবহুল জীবনে, নানা পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁর জীবনের মূলধারা ছিল অপরিবর্তিত। তিনি সব সময় সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন। তাঁর চরিত্রে মিশে ছিল হাসিখুশি ভাব, কোমলতা ও কঠোরতা। আপনি বিশ্বাসে, সত্যের জন্য সংঘাতে তিনি ছিলেন বজ্রের মতো কঠোর, পর্বতের মতো আটল। কিন্তু নারী-পুরুষ, বন্ধু-বান্ধব, শিশু কিশোর, আত্মীয়-স্বজন সবার সঙ্গে ব্যক্তিগত আচরণে তিনি ছিলেন কুসুমের মতো কোমল। তাঁর চরিত্র ছিল গ্রীতিতে, মমতায়, স্নেহে, সৌজন্যে দয়ার আধার। জীবনে কাউকে তিনি কড়া কথা বলেননি, কাউকে অভিসম্পাত দেননি। নিজে নির্যাতিত হয়েও প্রতিদানে তিনি ক্ষমা করেছেন।

হযরত মানুষে মানুষে ভেদাভেদের পরিবর্তে সাম্যের বাণী প্রচার করে গেছেন। তিনি চরম দুরবস্থা-কবলিত ক্রীতদাসের পরিত্রাণের জন্য কাজ করে গেছেন। নারীর অবস্থার পরিবর্তন ও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। অন্য ধর্মের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার ও সহিষ্ণু।

হযরত কুসংস্কারকে কখনো প্রশ্ন দেননি। যা সত্য, যা যুক্তিশাহী, তার পক্ষেই তিনি অবস্থান নিয়েছেন। হযরত জ্ঞানচর্চার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন সব সময়। এর ফলে মুসলিম সমাজ জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েছে।

লেখক-পরিচিতি

হবীবুল্লাহ্ বাহার ছিলেন কবি নজরুল্লের ‘ভক্ত শিষ্য’ এবং চিন্তা ও কর্মে পুরোপুরি মানবতাবাদী। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফেনী জেলায় জন্মাট্টহণ করেন। মুলত প্রবন্ধকার হলেও তিনি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন।

যেমন ‘ওমর ফারুক’, ‘আমীর আলী’ ইত্যাদি। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. মহামানবদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে তাদের অনুসরণে ৫টি কল্যাণকর কাজের তালিকা কর।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হ্যরত মুহাম্মদ (স.) কোন ক্ষেত্রে বজ্জ্বের মতো কঠোর ছিলেন?

ক. গভীর আত্মবিশ্বাসে	খ. নারীর মর্যাদা রক্ষায়
গ. সত্য ও সংঘাতের চেতনায়	ঘ. সাম্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায়
২. ‘এদের জ্ঞান দাও থানু – এদের ক্ষমা কর’ – উক্তিটির মধ্য দিয়ে হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রাধান্য পেয়েছে?

ক. ক্ষমা ও মহানুভবতা	খ. দয়া ও করণা
গ. প্রেম ও ভালোবাসা	ঘ. বাংসল্য ও ন্যায়বিচার
৩. ‘কারূণ জন্ম বা মৃত্যুতে চন্দ-সূর্যে গ্রহণ লাগতে পারে না’ – উক্তিটির মধ্য দিয়ে হ্যরতের কোন ধরনের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?

ক. সাম্যবাদিতার	খ. মানবপ্রেমের
গ. সংক্ষারমুক্তির	ঘ. দৃঢ়বিশ্বাসের
৪. কোন দৃষ্টিকোণ থেকে আরবের লোকেরা – ছিল অসাধারণ?

ক. সহিংসতার	খ. ধৈর্যের
খ. পেশিশক্তির	ঘ. স্মৃতিশক্তির

সূজনশীল প্রশ্ন

১। হযরত মুহাম্মদ (স.) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের কোনো অহমিকা তাঁর ছিল না। মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অফুরন্ত। সকলের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল হাসিমাখা। ছোট ছেট শিশুদের তিনি খুব বেশি ম্লেহ করতেন। তাঁর বালক-বন্ধুর সাথে দেখা হলে তিনি বন্ধুর বুলবুলি পাখির খবর নিতেও ভুলে যেতেন না।

ক. হযরত মুহাম্মদ (স.) কোন ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন?

খ. মানুষের প্রতি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আচরণ কীরুপ ছিল – উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

গ. সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা উন্নয়নে রাসূল (স.) এর আদর্শ কতটুকু ফলদায়ক যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

ঘ. বালক-বন্ধুর কাছে তিনি বুলবুলির খবর জানতে চাইলেন, এ ঘটনার মধ্যে দিয়ে তাঁর চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় বিশ্লেষণ কর।

শব্দ থেকে কবিতা

হমায়ুন আজাদ



কবিতা কাকে বলে, বলা খুব মুশকিল। কিন্তু আমরা যারা পড়তে পারি, তারা কম-বেশি কবিতা চিনি। কবিতারও চেহারা আছে। বইয়ে বা পত্রিকায় যে-লেখাগুলো খুব সুন্দরভাবে ছাপানো হয়, যে-লেখাগুলো, পঞ্জিকণ্ঠগুলো খুব বেশি বড় হয় না, যে-গুলোতে একটি পঞ্জিক আরেকটি পঞ্জিক সমান হয়, সে-লেখাগুলোই কবিতা। যে-লেখাগুলো পড়লে মন নেচে উঠে; গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, চোখে বুকে রং-বেরঙের স্পর্শ এসে জমা হয়, তা-ই কবিতা। যা পড়লে, দু-তিনবার পড়লে আর ভোলা যায় না, মনের ভেতর যা নাচতে থাকে, তা-ই কবিতা।

কবিতা কারা লেখেন? কবিরা লেখেন কবিতা। তাঁরা একটি শব্দের পাশে আরেকটি শব্দ বসিয়ে, একটি শব্দের সাথে আরেকটি শব্দ মিলিয়ে কবিতা লেখেন। আমরা যদি কিছু বানাতে চাই, তাহলে কিছু-না-কিছু জিনিস লাগে। উপমা একটি ষুড়ি বানাতে চায়। ষুড়ি বানালোর জন্যে উপমার দরকার লাল-নীল কাগজ, সুতো, বাঁশের টুকরো। মৌলি একটি পুতুল বানাতে চায়। তার দরকার হলদে টুকরো কাপড়, সুতো, তিনটা লাল বোতাম, দুটো সবুজ কাঁটা, একটু তুলো। তেমনি কবিতা বানাতে হলেও জিনিস চাই। কবিতার জন্যে দরকার শব্দ — রংবেরঙের শব্দ। ‘পাখি’ একটা শব্দ, ‘নদী’ একটা শব্দ, ‘ফুল’ একটা শব্দ, ‘মা’ একটা শব্দ; এমন হাজারো শব্দের দরকার হয় কবিতা লেখার জন্যে। যে শব্দকে ভালোবাসে খুব, শব্দকে আদর করে করে যে খুব সুখ পায়, সে-ই হতে পারে কবি। কবিরা গোলাপের ঘরতো

সুন্দর সুন্দর কথা বলেন, চাঁদের মতো স্পন্দন দেখেন। তুমিও গোলাপের মতো সুন্দর কথা বলতে চাও, চাঁদের মতো স্পন্দন দেখতে চাও? তোমার যদি শব্দের জন্যে আদর-ভালোবাসা না থাকে, তাহলে পারবে না তুমি গোলাপের মতো লাল গঞ্জভরা কথা বলতে, চাঁদের মতো জ্যোৎস্নাভরা স্পন্দন দেখতে।

তুমি কি লিখতে চাও ফুলের মতো কবিতা? বানাতে চাও নৃপুরের শব্দের মতো ছড়া? যদি চাও তবে তোমাকে সারাদিন ভাবতে হবে শব্দের কথা। খেলতে হবে শব্দের খেলা। নানান রকমের শব্দ আছে আমাদের ভাষায়। তোমাকে জানতে হবে সে-সব শব্দকে। কিছু কিছু শব্দ আছে, যেগুলোর গায়ে হলুদ-সবুজ-লাল-নীল-বাদামি-খয়েরি রং আছে। তোমাকে চিনতে হবে শব্দের রং। অনেক শব্দ আছে, যেগুলোর শরীর থেকে সুর বেরোয়: কোনো কোনো শব্দে বাঁশির সুর শোনা যায়, কোনো কোনো শব্দে শোনা যায় হাসির সুর। কোনো শব্দে বাজে শুকনো পাতার খসখসে আওয়াজ, কোনোটিতে বেহালার সুর। কোনো কোনো শব্দ তোমার পায়ের নৃপুরের মতো বাজে। তোমাকে শুনতে হবে শব্দের সুর ও স্বর। অনেক শব্দ আছে বাঙলা ভাষায় যেগুলোর শরীর থেকে সুগন্ধ বেরোয়। কোনোটির শরীর থেকে ভেসে আসে লাল গোলাপের গন্ধ, কোনোটির গা থেকে আসে কঁঠালচাঁপার আগ, কোনোটি থেকে আসে বাতাবিলেবুর সুবাস। তুমি যদি দেখতে পাও শব্দের শরীরের রং, শুনতে পাও শব্দের সুর, টের পাও শব্দের সুগন্ধ, তাহলেই পারবে তুমি কবি হতে।

কবিরা শব্দ দিয়ে লেখেন নানান রকমের কবিতা। কখনো তাঁরা খুব হাসির কথা বলেন, কখনো বলেন কান্নার কথা। কখনো তাঁরা বলেন স্পন্দনের কথা, কখনো তাঁরা চারপাশে যা দেখেন, তার কথা বলেন। কিন্তু সব সময়ই তাঁরা কথা বলেন শব্দে। শব্দ বসিয়ে বসিয়ে তাঁরা বানান কবিতা। কবিতা লিখতে হলে প্রথমেই জানতে হবে নানান রকমের শব্দ। তারপর আসে শব্দ দিয়ে যা বলতে চাই, তার কথা। কিন্তু কীভাবে বলা যায় সেই কথা?

কবিতায় আমরা অনেক কিছু বলতে পারি। কখনো বলতে পারি ঘর-ফাটাণো হাসির কথা। বলতে পারি টগবগে রাগের কথা। বলতে পারি খুব চমৎকার ভালো কথা। কখনো বাজাতে পারি নাচের শব্দ। আবার কখনো আঁকতে পারি রঙিন ছবি। কিন্তু সব সময়ই মনে রাখতে হবে, ওই কথা নতুন হতে হবে। যা একবার কেউ বলে গেছে, যে-ছবি একবার কেউ একে গেছে, তা বলা যাবে না, সে-ছবি আঁকা যাবে না। আর কথা বলতে হবে, নাচতে হবে, ছবি আঁকতে হবে ছন্দে। তাই কবিতা লিখতে হলে শব্দকে জানতে হবে, জানতে হবে ছন্দ, আর থাকতে হবে স্পন্দন। যার চোখে স্পন্দন নেই, সে কবি হতে পারে না। স্পন্দন থাকলে মনে আসে নতুন ভাবনা, নেচে নেচে আসে ছন্দ, আর শব্দ।

যে কোনো বিষয় নিয়েই তুমি লিখতে পারো কবিতা। বাড়ির পাশের গলিটা, দূরের ধানখেতটা, পোষা বেড়ালটা বা পুতুলটাকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়, যদি মনে স্পন্দন থাকে। রাস্তার দোকানিকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়, যদি স্পন্দন থাকে। আর যা নেই, তা নিয়েও কবিতা লেখা যায়, যদি স্পন্দন থাকে। এবার একটা কবিতা লেখা যাক। কবিতাটির নাম দিচ্ছি ‘দোকানি’। রাস্তার মোড়ের দোকানদারকে তুমি-আমি চিনি। সে বিক্রি করে সাদা দুধ, খয়েরি চকোলেট, লাল পুতুল, সবুজ পান। এসব জিনিস আমরা কিনে খাই, দোকানিকে চকচকে টাকা দিই। তার জিনিসপত্র বিক্রি দেখে মাথায় আমার একটা ভাব এলো। ভাবটা হলো : আমি একটা দোকান খুলেছি দুদিন ধরে, কিন্তু সে-দোকানে দুধ, চকোলেট, পান বিক্রি হয় না। বিক্রি হয় এমন সব জিনিস, যা কেউ বেচে না, যা কেউ কেনে না। শুধু স্পন্দনেই সে-সব জিনিস বেচাকেনা চলে। ভাবটা মাথায় এলো, সঙ্গে শব্দ এলো, আর ছন্দ এলো। প্রথমে লিখলাম :

দুদিন ধরে বিক্রি করছি
চকচকে খুব চাঁদের আলো
টুকুটুকে লাল পাখির গান ।

কথাটাই চমক দেয় সবার আগে : চকচকে চাঁদের আলো, টুকুটুকে লাল পাখির গান বিক্রির ব্যাপারটা বেশ নতুন । সারা পৃথিবীতে খুঁজে এমন দোকান পাওয়া যাবে না । ছন্দটাও বেশ, দুলে দুলে আসছে । এ-তিনটি পঙ্কজি পড়ার সাথে সাথে শব্দ, ছন্দ, কথা মিলে এক রকম স্বপ্ন তৈরি হয় চোখে আর মনে । এরপর আরও এগিয়ে গিয়ে লিখলাম :

বিক্রি করছি চাঁপার গন্ধ
স্বপ্নে দেখা নাচের ছন্দ
গোলাপ ফুলের মুখের রূপ ।

এখানে ছন্দ-মিল আরও মধুর । বিক্রির জিনিসগুলো আগের মতোই চমকপ্রদ । তবে এখানে স্বপ্ন আরও বেড়েছে, ছবিও আরও রঙিন । চাঁপার গন্ধ পাওয়া গেল এবং বেজে উঠল স্বপ্নে দেখা নাচের ছন্দের নৃপুর । এ-নাচ স্বপ্ন ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না, এমন নাচ নাচতে পারে না কেউ । ‘গোলাপ ফুলের মুখের রূপ’ বলার সাথে সাথে গোলাপ ফুল একটি মিষ্টি মেয়ের মতো ফুটে উঠল, মেয়েটির মুখ হয়ে উঠল গোলাপ, আর গোলাপ হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ । স্বপ্ন জড়ে হলো চোখে ।

কবিতাটিকে আমি আর লিখতে চাই না । ইচ্ছে হলে তোমরা লিখতে পার । কবিতা লিখতে হলেই নতুন কথা ভাবতে হবে, আর সে-কথাকে পরিয়ে দিতে হবে শব্দ ও ছন্দের রঙিন সাজপোশাক । তোমরা এখন ছোট, এ-ছোট থাকার সময়টা বেশ সুন্দর । বারবার আমার ছোট সময়ের কথা মনে পড়ে । আমি দেখতে পাই, ছোট আমি দাঁড়িয়ে আছি পুরুরের পাড়ে, একটা সাদা মাছ লাফ দিয়ে আবার ঢুকে গেল পানিতে । দেখতে পাই শাপলা ফুটেছে, পানি লাল হয়ে গেছে । একটা চড়ুই উড়ে গেল, তার ঠোঁটে চিকন একটা কুটো । এসব আমাকে কবিতা লিখতে বলে ।

তোমরা এখন ছোট, এ বয়সে তোমরা খুব বেশি করে দেখে নেবে । যত পার, দেখ । দেখ, দেখ এবং দেখ । বুকের মধ্যে, মনের মধ্যে ছবি জয়াও, রং জয়াও, সুর জয়াও । বড় হলে এ ছবি, সুর, রং তোমাদের খুব উপকার করবে । খুব ছোট বয়সে কি কবিতা লেখা উচিত? ছোট বয়সে উচিত কবিতা পড়া, পড়া এবং পড়া । চারদিকের ছবি দেখা, দেখা এবং দেখা । ছোট বয়সে বুকে জয়ানো উচিত শব্দ আর ছন্দ । তারপর একদিন, যখন বড় হবে, শব্দ, ছন্দ, ছবি, সুর, রং সব দল বেঁধে আসবে তোমার কাছে, বলবে আমাদের তুমি কবিতায় রূপ দাও । তুমি হয়তো একা একা ঘরে বসে শব্দ-ছন্দ-ছবি-সুর-রং মিলিয়ে বানাবে এক নতুন জিনিস, যার নাম কবিতা ।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

উপমা	-	তুলনা । এখানে একটি মেয়ের নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ।
নৃপুর	-	পায়ে পরার অলংকার ।
চমকপ্রদ	-	যা অবাক করে দেয় ।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল হতে অনুপ্রাণিত করা ।

পাঠ-পরিচিতি

সাহিত্যের নানা রূপের মধ্যে একটি হচ্ছে কবিতা। রচনাটিতে কবিতার শিল্পরূপ ও তার বৈশিষ্ট্য অপরূপ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। কাকে বলা যায় কবিতা? লেখকের মতে, যা পড়লে মনের স্মপ্ত জেগে ওঠে, ছবি ভেসে ওঠে, তাই কবিতা। শব্দের সঙ্গে শব্দ মিলিয়ে লেখা হয় কবিতা।

কেবল কবিরাই লিখতে পারেন কবিতা। কেননা কবিরাই স্মপ্ত দেখতে পারেন, তাঁরাই পারেন স্মপ্তের ছবি আঁকতে। নতুন ছবি নতুন ভাব কেবল কবিদের চেতনায় খেলা করে বলে তারা লিখতে পারেন কবিতা। কবিতা লিখতে হলে শব্দের রূপ-রং-গঢ়-বর্ণ-সুর ও ছন্দ চিনতে হয়, জানতে হয়। কবিরা চেনেন এবং জানেন শব্দের এসব মায়াবী রূপ। তাই তাঁরা লিখতে পারেন কবিতা।

অনেক বিষয় নিয়েই কবিতা লেখা যায়। তবে কবিতা লেখার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন স্মপ্ত। যিনি স্মপ্ত দেখতে জানেন না, তিনি লিখতে পারেন না কবিতা। স্মপ্ত দেখার জন্য শৈশব-কৈশোরে পড়তে হবে কবিতার পর কবিতা, দুচোখ মেলে দেখে নিতে হবে যা-কিছু ঢেখে পড়ে, তার সবটা। অর্থাৎ কবিতা লেখার জন্য চাই অভিজ্ঞতা। কবিতার রূপ ও তার রচনা-কৌশল বর্তমান রচনার উপজীব্য।

লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের বিশিষ্ট গদ্যশিল্পী, ভাষাবিজ্ঞানী, উপন্যাসিক ও কবি হ্রাম্যুন আজাদ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে মুগীগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো : কাব্য — ‘অলৌকিক ইস্টমার’, ‘জুলো চিতাবাঘ’, ‘সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে’, ‘কাফনে মোড়া অশ্ববিন্দু; উপন্যাস — ‘ছাপাক্ষ হাজার বর্গমাইল’, গল্প — ‘যাদুকরের মৃত্যু’, প্রবন্ধ — ‘লাল নীল দীপাবলি’, ‘কতো নদী সরোবর’ ইত্যাদি।

হ্রাম্যুন আজাদ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে মুত্যবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার পড়া কোনো কবিতা বা গল্প অবলম্বনে তোমার তালো লাগা বা ভালো না-লাগাণুলো যুক্তিসহকারে লেখ।

খ. টেলিভিশন বা অন্য কোনো মিডিয়াতে তোমার দেখা কোনো নাটক নিয়ে একটি সমালোচনা লেখ।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবিতা লিখতে হলে প্রথমেই কোনটি জানতে হবে ?

- | | |
|---------|---------|
| ক. কথা | খ. কৌশল |
| গ. শব্দ | ঘ. ছন্দ |

২. ‘শুধু স্বপ্নেই সেসব জিনিস বেচা-কেনা চলে।’ - এ বাকেয় বেচা-কেনা শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ?

- | | |
|----------------|------------------|
| ক. বিনিময় পথা | খ. ক্রয়-বিক্রয় |
| গ. দেনা-পাওনা | ঘ. আদান-প্রদান |

নিচের কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

চপল পায় কেবল ধাই,
কেবল গাই পরির গায়
পুলক মোর সকল গায়,
বিভোল মোর সকল থাণ ।

৩. কবিতাংশে ‘শব্দ থেকে কবিতা’ প্রবক্ষের কবিতা রচনার কোন দিকটির পরিচয় পাওয়া যায় ?
- | | |
|------------------|--------------------|
| ক. শব্দ প্রয়োগে | খ. ছন্দের ব্যবহারে |
| গ. সাবলীল ভাষা | ঘ. উপমার প্রয়োগ |
৪. উপর্যুক্ত বিময়টি নিচের কোন কথাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ?
- | | |
|----------------------|-------------------|
| ক. ছবিও আরও রঙিন | খ. দুলে দুলে আসছে |
| গ. খেলতে শব্দের খেলা | ঘ. যত পারো দেখ । |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. মাহফুজা চমৎকার কবিতা লেখেন। জীবনে বিভিন্ন অংশের স্মৃতিকে শব্দের ভিতর সাজাতে পছন্দ তাঁর। মাহফুজার ভাইপো নির্বর তাঁকে খুব পছন্দ করে। কারণ তিনি তাঁর ভাইপো নির্বরকে প্রায়ই নানা রকম কবিতা শোনান। নির্বর ফুফুকে পেলেই ছড়া শোনার বায়না ধরে। একদিন নির্বর তাঁকে বলে “ফুফু তুমি এতো সুন্দর কবিতা কীভাবে লেখ?” মাহফুজা উত্তর দেন, “তুমি তোমার চারপাশের সুন্দর স্মৃতিয়ে শব্দগুলোকে বুঝে ধারণ করে রাখবে, দেখবে তুমিও একদিন চমৎকার কবিতা লিখতে পারবে।”
- | |
|---|
| ক. কবিতা লেখার জন্য প্রথমেই কোনটি প্রয়োজন ? |
| খ. ‘কবিতার জন্য দরকার শব্দ – রংবেরঙের শব্দ’ – বুঝিয়ে লেখ । |
| গ. কবিতার বিষয়ে নির্বরের প্রশ্নের উত্তর ‘শব্দ থেকে কবিতা’ প্রবক্ষে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে – লেখ । |
| ঘ. মাহফুজার উত্তর ‘শব্দ থেকে কবিতা’ প্রবক্ষের মূলভাবকে ধারণ করে কি? ” যুক্তিসহ বিচার কর । |

হ্যরত আবদুল কাদির জিলানি (র.)



হ্যরত মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হয়েছে ‘উস ওয়াতুল হাসানা’ বা সুন্দরতম আদর্শ। সেই জীবনের সহস্রশ্রে যাঁরা এসেছে, তাঁদের জীবন মহান গুণাবলিতে অকীর মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যাঁরা দিনের জন্য জীবন কুরবানি করেছেন, মানুষের বিগুল কল্যাণ সাধন করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন হ্যরত আবদুল কাদির জিলানি (র.)।

শুধু আলোর অভাবকেই অস্থকার বলে না। মানুষের মনে যখন সুখ-শান্তি থাকে না, সমাজে চলতে থাকে অন্যায়, অবিচার, অরাজকতা, দেশ থেকে বিদায় নেয় আইন, শৃঙ্খলা, ধর্ম, তখন দেখা দেয় সত্যিকার অস্থকার। এখানে এমনি এক অস্থকার ঝুঁগের কথা বলছি।

সেই ঝুঁটি ছিল প্রায় হাজার বছর আগের। আর সেটা ছিল গোটা মুসলিম জাহানের জন্য বড়ই দুর্দিন। তখন রোম সাম্রাজ্য ছিল খ্রিস্টানদের অধীন। তার চার পাশে রয়েছে পারস্য, সিরিয়া, মিশর এবং আরও কতগুলো মুসলিম দেশ। শক্তিতে মুসলমানগণ ছিল পরাক্রমশালী কিন্তু দেশের সর্বত্র বিরাজ করছিল হিংসা, বিষেষ, অত্যাচার- অনাচার, হানা-হানি ও শোষণ।

মুসলিম জাহানে যখন এমনি দুর্দিন ঠিক সেই সময় আল্লাহর অসীম রহমত স্বরূপ হ্যরত আবদুল কাদির (র.) আমাদের মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সেটা ছিল ১০৭৭ সাল। ৪৭০ হিজরির রমযান মাস। তাঁর জন্মস্থান ছিল পারস্য দেশের জিলান শহরে। জিলানের বাসিন্দা বলে তাঁর ভক্তরা তাঁর নামের শেষে জিলানি পদবি জড়ে দেন। তাঁর পিতা ছিলেন হ্যরত আবু সালেহ তখনকার দিনে একজন মশতুর আলেম এবং মাত্তা ছিলেন হ্যরত সাইয়েদা উম্মুল ফাতেমা (র.)। তিনি ছিলেন খুবই পরহেজগার মহিলা।

ছোটবেলা থেকেই হ্যরত আবদুল কাদির জিলানি (র.) একটু ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। সমবয়সী ছেলেরা যখন খেলাধুলা, হৈ-হল্লা করত, তিনি তখন চুপচাপ বসে কী যেন ভাবতেন। কখনো কখনো তাদের সঙ্গে খেলতে গেলেও হঠাৎ খেলার মধ্যে আনমন্ত হয়ে পড়তেন। খেলা ছেড়ে চলে আসতেন বাড়িতে। একা এবং নিরিবিলিতে থাকতেই যেন তাঁর বেশি ভালো লাগত।

বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন। মাঝের কুরআন তিলাওয়াত শুনে তিনি পাঁচ বছর বয়সেই কুরআনের আঠারো পারা মুখস্থ করে ফেলেন।

পাঁচ বছর বয়সে তিনি মন্তব্যে ভর্তি হন। পড়াশোনায় তিনি ছিলেন খুবই মনোযোগী। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অনেক কিছু শিখে ফেলেন। অন্য ছাত্ররা সাতদিন যতটুকু পড়া আয়ত্ত করত তিনি দু-এক দিনেই তা আয়ত্ত করতেন। সম্পূর্ণ কুরআন শরিফ মুখস্থ করা ছাড়াও হাদিস শরিফ পাঠেও তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। অল্প বয়সেই ভালো মেধাবী ছাত্র হিসাবে তার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু মন্তব্যের বই পড়েই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না, জীবন, জগৎ ও প্রকৃতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। তিনি যখন যে বিষয়ে পড়াশোনা করতেন, তা শেষ না করে ক্ষান্ত হতেন না। শিক্ষকদের নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে জানবার আগ্রহ দেখাতেন। তাঁরা তাঁর এই অদ্যম জ্ঞান পিপাসা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখে অবাক হয়ে যেতেন। তাঁরা দুহাত তুলে তার জন্য আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করতেন।

মন্তব্যের পড়া শেষ না হতেই তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। তখন সংসারের সমস্ত ভার এসে পড়ে বালক আবদুল কাদিরের উপর। তাঁদের আর্থিক অবস্থাও তেমন ভালো ছিল না। তাই তাঁকে নিজ হাতে সংসারের অনেক কাজ করতে হতো। কিন্তু সংসারের নানা প্রকার চাপ তাঁর বিদ্যা শিক্ষার আগ্রহকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। সময় মতো সংসারের কাজকর্ম শেষ করে আবার লেখা পড়ায় ডুবে যেতেন তিনি।

ছোটবেলা থেকেই ধর্মের খুঁটিনাটি বিষয় তিনি সংযুক্ত মেনে চলতেন। সেই বয়সেই তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী। সহপাঠী ও সম-বয়সীদের সঙ্গে তিনি কখনো কোনো বিষয়ে তর্ক ঝগড়া করতেন না। তাঁর জ্ঞান বুদ্ধি ও সদাচারে সবাই মুগ্ধ ছিল। সবাই তাকে শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসত।

বাগদাদ ছিল তখন মুসলিম খলিফাদের রাজধানী। জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রস্থল বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসা ছিল তখনকার বিশ্বের সেরা জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। দেশ-বিদেশের ছাত্ররা এখানে পড়াশোনার জন্যে এসে ভীড় জমাত। এখানকার শিক্ষকগণও ছিলেন খুবই জ্ঞানী ও গুণী। সে সময় বাগদাদে ছিল বহু আউলিয়া দরবেশের আস্তানা। তাঁরা সত্যের পথ দেখিয়ে গোমরাহ মানুষকে ধর্মের পথে নিয়ে আসতেন। আল্লাহর প্রিয় বান্দা হবার পথ দেখাতেন। হ্যরত আবদুল কাদির জিলানি (র.) যখন গ্রামের মন্তব্যের পাঠ শেষ করলেন, তখন তার বয়স মাত্র সতেরো বছর। এবার নিয়ত করলেন তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান নিজামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হবার। এবিষয়ে অদ্যম আগ্রহ জেগে উঠল তাঁর অন্তরে।

কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো আর বাগদাদে যাওয়া যায় না, বাধা অনেক। জিলান শহর থেকে বাগদাদের দূরত্ব চারশ মাইল। যাতায়াতের জন্য তখনকার দিনে তেমন কোনো যানবাহন ছিল না, পথ ছিল দুর্গম। তাছাড়া পথে ছিল ডাকাতের উৎপাত। তাই অনেক লোক দল বেঁধে যাতায়াত করত। হ্যরত আবদুল কাদির জিলানি (র.) বাগদাদে যাওয়ার ব্যাপারে দ্বিতীয় সমস্যা ছিল তার আর্থিক দুর্গতি। বিশেষ করে মা বৃদ্ধ, বিদেশ চলে গেলে পিতৃহীন বালকের এই বৃদ্ধি মাকে কে দেখবেন?

কিন্তু উপায় নেই শত বাধাবিপত্তি থাকলেও হ্যরত আবদুল কাদির (র.) কে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতেই হবে। বৃদ্ধা মাঝেরও একান্ত ইচ্ছা; ছেলে লেখাপড়া শিখে বিদ্যান হোক, বড় আলেম হোক। মানুষকে আলোর পথ দেখাক।

মা জানতেন, তাঁর ছেলের মধ্যে বিরাট প্রতিভা লুকিয়ে আছে। উচ্চ শিক্ষা না পেলে তার এই প্রতিভার বিকাশ ঘটবে না। তিনি তাই ছেলেকে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বাগদাদ যাওয়ার পরামর্শ দিলেন এবং কাফেলার সম্মতি করতে বললেন।

আল্লাহ মেহেরবান, দেখতে দেখতে সুযোগ এসে গেল। হ্যরত আবদুল কাদির জিলানি (র.) এক কাফেলার সম্মতি পেলেন। কাফেলার সবাই সওদাগর এবং তাঁরা জিলান শহর থেকে বাগদাদে যাবেন। এই কাফেলার কথা আবদুল কাদির জিলানি (র.) মাকে জানালেন। বৃদ্ধা মা ছেলেকে বাগদাদ পাঠাবার জন্য সমস্ত আয়োজন করলেন। সেকালে ডাকের প্রচলন ছিল না। ইচ্ছা করলেই যখন তখন টাকা পাঠানো যেত না। মা অতি যত্নে জামার বগলের নিচে চলিশটি দিনার সেলাই করে দিলেন যাতে ডাকাতি বাচুরি না হয়। রওয়ানা দিলে বিদায়ের বেলা মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন- ‘বাবা’ বিদায় বেলা আমি তোমাকে কয়েকটি কথা বলছি, তা তুমি সব সময় মনে রাখবে। প্রথমত সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে সব সময় আল্লাহর উপর ভরসা রাখবে। দ্বিতীয়ত জান গেলেও কখনো মিথ্যা কথা বলবে না। সত্যবাদিতা মুক্তি দান করে এবং মিথ্যা ধৰ্মস করে - রাসূল (স.) এর এই হাদিসটি সব সময় সরণ রেখ। হ্যরত আবদুল কাদির জিলানি (র.) মাঝের নিকট হতে বিদায় নিয়ে মিলিত হলেন কাফেলার সঙ্গে।

এ সম্পর্কে একটি গল্প আছে।

কাফেলা চলছে। হঠাৎ একদিন সে কাফেলার উপর হামলা হলো ডাকাতের। তারা কাফেলার বণিকদের সবকিছু কেড়ে নিল। তাঁরপর তাদের একজন এগিয়ে এলো ছেলেটির কাছে, জিজেস করল, ‘কী হে ছোকড়া, তোমার কাছে কিছু আছে কি?’

ছেলেটি নির্ভয়ে জবাব দিল- ‘হ্যাঁ, আমার কাছে চলিশটি সোনার মোহর আছে।’

‘কোথায়?’

‘এই যে, জামার আস্তিনের নিচে সেলাই করা।’

ছেলেটির সহজ সরল জবাবে ডাকাতটি বিশ্বাস করতে পারল না। ভাবল নিতান্ত গরিব ছেঁড়া কাপড় এর কাছে কি করে এতগুলো সোনার মোহর থাকবে। ছেলেটি নিশ্চয় তার সাথে রসিকতা করছে।

কথাটা সে বলেও ফেল, ‘তুমি কি আমার সাথে রসিকতা করছ?’

ছেলেটি বলল- ‘নাউজুবিল্লাহ! আপনার সাথে কি রসিকতা করা যায়? বিশ্বাস না হয় দেখুন’- এই বলে সে আস্তিনের সেলাই খুলে মোহরগুলো ডাকাতকে দেখাল।

ডাকাতটি এবার অবাক। সে তার পা থেকে মাথা অবধি কয়েকবার দেখে নিল। তাঁরপর বলল- ‘দেখো বাপু, কাফেলায় ডাকাত পড়লে সবাই ভয়ে কাঁপতে থাকে। মালপত্র টাকাকড়ি লুকাবার চেষ্টা করে। আর তুমি কি না নির্ভয়ে বলে দিলে তোমার কাছে চলিশটি সোনার মোহর আছে। ডাকাতের কাছে সত্যি বলতে গেলে কেন? তুমি নিজে না বললে তো আমরা মোহরের কথা জানতেই পারতাম না।’

ছেলেটি বলল- আমার কাছে যে চলিশটি সোনার মোহর আছে, এটা তো সত্যি। আপনি না জানলেও যিনি সবকিছুই জানেন, সেই আলেমুল গায়ের আল্লাহ রাবুল আলামিনের কিছুই অজান নেই। মিথ্যে বলে আপনাকে আমি ধোঁকা দিতে পারি, কিন্তু আল্লাহকে তো আর ফাঁকি দিতে পারি না। তা ছাড়া, বাড়ি থেকে রওয়ানা হওয়ার

সময় আম্মা আমাকে বলে দিয়েছেন, হাজার বিপদে পড়লেও যেন মিথ্যা কথা না বলি। আম্মা আরও বলেছেন সত্যবাদিতা মুশকিল আসান করে। এখন বলুন তো তাঁর কথা অমান্য করে কিভাবে আপনাকে মিথ্যে কথা বলি? ডাকাতটির তরু কিন্তু বিশ্বাস হতে চায় না। লুটতরাজ সেরে ছেলেটিকে নিয়ে গেল সরদারের কাছে।

সরদার ছেলেটির সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল। শুনতে শুনতে নানান ভাবনার উদয় হলো তার মনে। কতই বা বয়স হবে ছেলেটার অর্থ এর এত মনের জোর! আল্লাহর প্রতি এর কি অটল বিশ্বাস! মায়ের প্রতি তার অবিচল শ্রদ্ধা। সত্যের জন্য এত ত্যাগ স্বীকার! আর সে? সে নিজে কী করছে? জীবন ভর শুধু ডাকাতি। অসহায় পথিককে খুন জখম করে তাদের ধন কেড়ে নিয়েছে- এখনও নিচে।

এত সব ভাবতে ভাবতে, ডাকাত সরদার বিচলিত হয়ে পড়ল; আল্লাহ-ভক্ত মা-ভক্ত ছেলেটির প্রতি শ্রদ্ধায় তার মন ভরে উঠে। তখনই সে তওবা করে ছেলেটির পায়ে পড়ে বলল- তুমি আমার জ্ঞানচক্ষ খুলে দিয়েছ। আজ থেকে এই পাপ কাজ ছেড়ে দিলাম। বাকি জীবন তোমার সঙ্গে থেকে তোমার সেবা করে কাটাব। বলা বাহুল্য, তাঁর সোহবতে থেকে এই ডাকাত একদিন আল্লাহর অলি হয়েছিলেন। এমনই সত্যবাদী বালক হলেন পরবর্তী কালের পীরানে পীর গাউসুল আজম হ্যরত আবদুল কাদির জিলানি (র.)।

১০৯৫ সালে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি তাঁর স্বপ্নের দেশ বাগদাদে এসে হাজির হলেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান এই সেই বাগদাদ। এখানে আসার জন্য তিনি আকুল হয়ে স্ফুর দেখতেন। সুন্দর পথের বাধা, দুঃখ কষ্ট এমনকি মুত্যুর ভয় তিনি উপেক্ষা করেছেন। অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয়, শুধু মাত্র জ্ঞান আহরণের জন্য তিনি এতো দীর্ঘ দুর্গম পথ পাঢ়ি দিয়ে এসেছেন। আঠারো বছরের তরুণ আবদুল কাদির এসে ভর্তি হলেন এখনকার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান নিজামিয়া মাদরাসায়। মনের সমস্ত দরদ আর ভালোবাসা ঢেলে দিলেন জ্ঞান সাধনায়। কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর অর্থ ফুরিয়ে গেল। একদিকে অদ্য জ্ঞান পিপাসা, অন্যদিকে অর্থের অভাবে বহুকষ্ট পেলেন তিনি। বহুদিন না খেয়েও কাটিয়েছেন। তবু তিনি তাঁর জ্ঞান পিপাসার উদগ্র বাসনাকে কোনো মতেই দমাতে পারলেন না। রাতদিন ক্ষুধার জ্বালা, অর্থের অভাব থাকা সত্ত্বেও লেখাপড়ায় কিন্তু এতটুকু গাফলতি নেই তাঁর। তিনি ছিলেন অসীম বৈর্য আর অটুট মনোবলের অধিকারী। নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে নয়টি বছর কেটে গেল আবদুল কাদির (র.) এর। সকল বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করে তিনি ঝাসে হাজির থেকেছেন। তিলে তিলে সংগ্রহ করেছেন জ্ঞানের উজ্জ্বল রত্ন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফিকাহ, দর্শন, ইতিহাস, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।

হাদিস শাস্ত্রে সাফল্য লাভ করার পর তাঁকে যখন সনদ দেওয়া হচ্ছিল তখন তাঁর শিক্ষক তাঁকে বলেছিলেন- ‘আবদুল কাদির, হাদিস বিষয়ে আমরা আজ তোমাকে যে সনদ দিচ্ছি, এটা একটা প্রচলিত নিয়ম মাত্র। তোমার জ্ঞানের পরিধি এ দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কারণ হাদিসের অনেক ব্যাখ্যা ও মর্মার্থ আমরা অনেক সময় তোমার সাথে আলোচনা করেই জানতে পেরেছি।’ উচ্চ শিক্ষা লাভের পর হ্যরত আবদুল কাদির জিলানি (র.) আত্মনিয়োগ করলেন আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য। তাঁর এই পিপাসা মিটানোর জন্য লোভ-লালসা, রাগ-হিংসা প্রভৃতি মানুষের দুশ্মনকে চরমভাবে ত্যাগ করলেন এবং পীর আউলিয়া ও দরবেশদের সোহবতে কাটালেন অনেক দিন। তরুণ মন থেকে লোভ-লালসা কিছুতেই দূর হতে চাইল না।

শেষে তিনি কঠোর সাধনায় মন দিলেন। লোকালয় থেকে দূরে জঙ্গালে নির্জন পরিবেশে চলে গেলেন। সমস্ত পার্থিব চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে মুছে একমাত্র আল্লাহর জিকিরে দিন কাটাতে লাগলেন। আল্লাহর ধ্যানে বাধা সৃষ্টি হয় বলে তিনি আরাম-আয়েশ ত্যাগ করলেন। ফলমূল থেয়ে সময় কাটাতেন। সারাক্ষণ

কুরআন তিলাওয়াতে, জিকিরে দুবে থাকতেন। রাতের ঘূমকে পরিত্যাগ করে সারারাত ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন।

এমনিভাবে কঠোর সাধনার ফলে হ্যরত আবদুল কাদির জিলানি (র.) একজন কামেল অলিতে পরিণত হলেন। তিনি হয়ে উঠলেন যেন এক ভিন্ন জগতের মানুষ। যে কাজ মানুষের কাছে ছিল অত্যন্ত কঠিন, তা-ই হয়ে গেল তাঁর কাছে অতি সহজ। যে পথে মানুষ চলতে ভয় পায় সে পথে নির্ভয়ে চলতেন তিনি। লাভ করলেন আল্লাহর পিয়ারা বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য।

তারপর লোকালয়ে ফিরে এসে তিনি মানব জাতির মহান উপকার করে দেশের মানুষকে কৃপথ, অত্যাচার ও অন্যায়ের পথ থেকে ফিরিয়ে আনলেন আল্লাহর পথে। লক্ষ লক্ষ মানুষ হয়ে উঠল তাঁর ভক্ত। আল্লাহর দুনিয়াতে তিনি অসাধ্য কাজকে সাধ্য করলেন। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, ইবাদতখানা তৈরি করলেন। মানুষের উপকারে সারা জীবন আত্মত্যাগ করে মানুষের মনের কোঠায় স্থান করে নিলেন চির জীবনের জন্য। নিজের কাজ নিজে করতেন, সহজ সরল জীবন যাপন করতেন বলেই তিনি সকলের শুন্ধার পাত্র হয়েছিলেন। তাঁর মায়ের স্বপ্ন সফল হলো। আল্লাহর মাহবুব বান্দা হয়ে তিনি দুনিয়া জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সবাই তাঁকে তাজিম করে ডাকত ‘বড়পীর’ বলে। সত্যিই তিনি ছিলেন বড়পীর গাউসুল আজম।

হিজরি ৫৬১ সাল, ১১ই রবিউস সানি। এশার নামাযের সময় হলো। তিনি হুকুম করলেন, তাঁকে গোসল দেওয়ার জন্য। গোসলের পর তিনি এশার নামায আদায় করলেন। মুনাজাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে তিনি ইস্তকাল করলেন। মুত্তুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল একানবই বছর।

(সংকলিত)

শব্দার্থ ও টীকা

সংস্পর্শে	— সম্পর্ক, সঙ্গ।
মোহর	— স্বর্ণমুদ্রা।
দৃষ্টান্তে	— উদাহরণ, নজির।
প্রতিভা	— স্বভাবজাত অসামান্য বুদ্ধি।
অরাজকতা	— শাসনহীন।
দিনার	— আরবের স্বর্ণমুদ্রা।
ক্ষান্ত	— ক্ষমাশীল, নিবৃত, বিরত।
কাফেলা	— তীর্থযাত্রী বা অমণকারী দল।
স্বল্পভাষী	— কম কথা বলে যে।
পাঠ পরিচিতি	

মানব কল্যাণে যাঁরা আত্মত্যাগ করেছেন সর্বজন শুন্ধেয় হ্যরত কাদির জিলানি (র.) তাঁদের অন্যতম। তাঁর বাল্য ও শিক্ষা জীবন অতি কষ্টের ছিল। তিনি মানুষের অঙ্গতা দূর করে বিপথগামীকে পথে এনে আল্লাহর জগতের মহাকল্যাণ সাধন করেছেন। বাল্যকালে পিতৃহারা হয়ে শিক্ষার্থী জীবনের অতিক্ষেত্রে পরেও কীভাবে লেখাপড়া করেছেন এবং একজন পরিপূর্ণ জ্ঞানী মানুষে পরিণত হয়েছেন এই বিষয়টি আলোচ্য পাঠে বর্ণিত হয়েছে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাগদাদের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল বিশ্বের সেরা জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র?

ক) নিজামিয়া মাদরাসা	খ) আলিয়া মাদরাসা
গ) জামেয়া	ঘ) জামেয়া আল-আজহার

২. ‘মায়ের প্রতি তার অবিচল শুদ্ধি, সত্যের জন্য এত ত্যাগ স্বীকার! আর সে? সে নিজে কী করেছে? জীবন ভর শুধু ডাকাতি’- এ বাক্য দিয়ে লেখক কী বুঝাতে চেয়েছেন?

ক) মায়ের প্রতি শুদ্ধি	খ) সত্যের প্রতি অবিচল মনোভাব
গ) ডাকাতি	ঘ) মানসিক যত্নগা

৩. হ্যরত আবদুল কাদির এর নামের সঙ্গে ‘জিলানি’ সংযুক্ত হয় কীভাবে?

ক) আরবদের নামকরণের প্রথানুযায়ী	খ) জিলানের বাসিন্দা বলে
গ) পিতামাতা নাম রাখার কারণে	ঘ) কোনটি নয়

অনুচ্ছেদটি পড়ে নিচের প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

আমা বলেছেন, সত্যবাদিতা মুশকিল আসান করে। এখন বলুন তো তাঁর কথা অমান্য করে কীভাবে আপনাকে মিথ্যে কথা বলি?

৪. উল্লিখিত উদ্ধৃতির সাথে হ্যরত আবদুল কাদির জিলানি (র.) এর কোন দিকটির সাদৃশ্য আছে?

ক) সত্যবাদিতা	খ) মায়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন
গ) সত্যের প্রতি স্থির থাকা	ঘ) উদারতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|-----------|
| ক) i | খ) ii |
| গ) iii | ঘ) i ও ii |

সুজনশীল প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের একটি সমৃদ্ধ গ্রামে সামান্য বিষয় নিয়ে দুটি গোত্রের বিবাদ ক্রমেই সংঘর্ষের রূপ নেয়।
বাড়ি-ঘর ও ক্ষেত্রের ফসল ধূস হয়। আব্দুল সামাদ সেই গ্রামের একজন কিশোর। সে এই সংঘর্ষে জড়িত
না হলেও ঘটনা দেখে বিমর্শ হয়ে পড়ে। মানুষের এই বিপর্যয়ে সে ব্যথিত ও চিন্তিত। সে সমবয়সী
কয়েকজনকে নিয়ে একদিন গোপন স্থানে সমাবেশ করে এবং এই সমাবেশ থেকে বর্তমান পরিস্থিতির
উত্তরণের জন্য কিছু কথা বলে ও অন্যদের মতামত চায়। সকলেই এই ব্যাপারে ভালো কিছু পরামর্শ দেয়।
 - ক. হ্যারত আব্দুল কাদির জিলানি (র.) এর জন্মস্থান কোথায়?
 - খ. ছোট বেলায় হ্যারত আব্দুল কাদির জিলানি (র.) এর স্বভাব কেমন ছিল?
 - গ. উদ্দীপকের আব্দুস সামাদের চিন্তাধারার সাথে হ্যারত আব্দুল কাদির জিলানি (র.) এর সাদৃশ্য কোথায়?
 - ঘ. উদ্দীপকটি হ্যারত আব্দুল কাদির জিলানি (র.) শীর্ষক রচনাটির মূল বক্তব্যকে ধারণ করেছে-
এই মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

পিতৃপুরষের গন্ধ হারুন হাবীব

অন্তর মামা বড় বেশি একটা ঢাকা শহরে আসেন না। ওর মা চিঠি লিখে কত বলেন, কাজল তুই ঢাকা শহরে চলে আয়। আমার বাসাতেই থাকবি যদিন চাকরি না হয়। কাজল মামা তবু আসে না। গ্রাম নাকি খুব ভালো লাগে কাজল মামার।

১৯৭১ সালে কাজল মামা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। পড়তে পড়তেই বেঁধে গেল যুদ্ধ। একদিন ঢাকা ছেড়ে হঠাতে সে গ্রামে এসে হাজির। তারপর রাতদিন এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে ছেলেদের জোগাড় করে মিছিল মিটিং। রাইফেল জোগাড় করে ট্রেনিং। আরও কত কি। অন্তর নানা কত বকতেন, ‘বাবা, এসব করিস নে। বিপদে পড়বি।’

‘ବାଘା ବାଞ୍ଗଲିରା ଏବାର ଯୁଦ୍ଧ କରବେ, ବାବା । ସ୍ଵାଧୀନତା ଏବାର ଆସବେଇ ।’ ସାହସ ନିଯେ ବଳତ କାଜଳ ମାମା ।

সেই কাজল মামাৰ যুদ্ধেৰ গল্প শুনবাৰ জন্য অধীৰ আগ্রহে অপেক্ষা কৰছে অন্ত। বাৰ্ষিক পৱৰিক্ষাৰ পৰ থেকেই। মা ওকে বুদ্ধি শিখিয়ে দিয়েছে, ‘তুই এক কাজ কৰ অন্ত। চিঠি লেখ মামাকে। বল, এবাৱেৰ একুশে ফেৰুয়াৱিতে যেন অবশ্যই ও ঢাকা আসে। আৱাও বল, তুই যুদ্ধেৰ গল্প শুনবাৰ জন্য অধীৰ আগ্রহে বসে আছিস। দেখবি ঠিক আসবে?’

বুদ্ধিটা অন্তর মাঁ'র হলেও এমন একটা কৌশল চিন্তা করত সে বেশ ক'দিন আগে থেকেই। কাউকে না জানিয়ে অন্ত চিঠি লিখেছে। সেও প্রায় দশ-বারো দিন হয়ে গেছে। আজ আঠারো তারিখ। তিনি দিন বাদেই মহান একুশে ফেরুয়ারি। ওর কেল যেন বিশ্বাস কাজল মামা আর কারও কথা শুনুক না শুনুক তার কথা রাখবেই, আসবেই সে ঢাকা।

অন্ত বরাবর রাত নটা-সাড়ে নটায় ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আজ রাতে সে দশটারও ওপরে জেগে থাকল। মা বললেন,
‘ঘুমাতে যাস নে কেন?’

অন্ত খুলে বলে না কিছু। এগারোটা বাজতেই কিন্তু ঘুমে চোখ বদ্ধ হয়ে আসে ওর। লেপের নিচে ঢুকতে ঢুকতেই সে কী গভীর ঘুম।

তোরবেলায় সে দেখল কাজল মাঝা তার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। লেগ থেকে বেরিয়ে এক লাফে উঠে বসল সে বিছানায়।

ମାମା ବଲଗେନ, ‘ଭାଲୋ ଆଛିସ ତୁଇ ଅନ୍ତି? ଶେଷ ରାତର ଦ୍ଵିନେ ଏଲାମ । ଏସେ ଦେଖି ତୁଇ ସୁମାଚିଷ୍ଟ ।’ ଅନ୍ତି ବଲେ, ‘ଆଜ କିନ୍ତୁ ଉନିଶ ତାରିଖ, ତା ତୋ ଜାନୋ ମାମା । ଦୁଇନ ବାଦେଇ ଏକଶେ ଫେରୁଙ୍ଗ୍ୟାରି ।’

মামা বললেন, ‘ঠিক আছে খানিকক্ষণ রেস্ট নিয়েই বেরংবো তোকে নিয়ে। যেখানেই যেতে চাস সেখানেই যাব। পাঁচ দিন আমি ঢাকায় থাকব — এর মধ্যে চার দিনই তোর সাথে। যেখানে যেতে চাবি যাব। যত গল্প শুনতে চাস শোনাব।’

ମୋହାମ୍ବଦପୁରେ ନୂରଜାହାନ ରୋଡ୍ ଥେକେ ଏକଟି ରିକଶା ଚାପଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆର କାଜଳ ମାମା । ଲାଲମାଟିଆ-ଧାନମଣି ହୟେ ରିକଶା ଚଲାଇଲା । ମାମା ବଲାଲେନେ, ‘ଏହି ସେ ରାସ୍ତାଟା ଦିଯେ ଆମରା ଯାଚିଛି ଏର ନାମ ସାତମ୍ବସଜିଦ ରୋଡ୍ । ଜାନିସି?’

‘କି ଯେ ବଲୋ ମାମା । ଜାନବ ନା କେନ ।’

‘ঠিক আছে বল দেখি সাতমসজিদ নাম হয়েছে কেন রাস্তাটার?’



‘তা তো ঠিক জানি না।’

‘এই অন্যই বলছিলাম, অতীতের অনেক জিনিসই জেনে রাখা ভালো আয়াদের। অতীত যানে আয়াদের আগের দিন। পুরনো দিনের শুপরেই তো বর্তমানের দিন-রাত গড়ে উঠে।’

কাজল আমা সংক্ষেপে বললেন। এই ঢাকা শহরের আগের নাম জাহাঙ্গীরনগর। মোগল বাদশা জাহাঙ্গীরের নামে। সেই সময় থেকেই শহরের আনাচে-কানাচে অনেক মসজিদ তৈরি হতে থাকে। এই রাস্তাটা পিলখানার মোড় থেকে মোহাম্মদপুর এসে সাতগম্বুজ মসজিদে ঠেকেছে। সেই পুরনো মসজিদের নামেই রাস্তাটার নাম হয়েছে সাতমসজিদ রোড।

রিকশাটা নিউমার্কেট পেরিয়ে নীলক্ষেত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্যে চুকড়েই অন্ত জিজেস করল, ‘তুমি নাকি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যামা?’

‘হ্যা, পড়তাম একদিন। তুই জানলি কী করো?’

‘মা বলছিল তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়তে তখনই শুক্র গিয়েছ।’

‘অন্ত, যুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে অনেক তফাও। যুদ্ধ হয় রাজায় রাজায় এক দেশে আরেক দেশে, মানুষের লোভ-লালসায়। যুদ্ধে শক্তি দেখায় একজন মানুষ — কষ্ট হয় সাধারণ মানুষের। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ হয় স্বাধীনতার জন্য, একটি জাতি হিসেবে বেঁচে থাকবার জন্য, সব অন্যায় অত্যাচার আর শূরুখল থেকে মুক্ত হবার জন্য। একাত্তর সালে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম — সাধারণ যুদ্ধ নয়।’

দেখতে দেখতে রিকশাটা রোকেয়া হল আর শামসুরাহার হল পেরিয়ে জগন্নাথ হলের সামনে এসে পৌছাল। কাজল মামা বললেন, ‘এই যে ডান পাশে বিল্ডিংটা দেখছিস ওটার নাম কি জানিস?’

‘না।’

‘জগন্নাথ হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসকে।’

‘তুমি থাকতে এখানে?’

‘না। আমি থাকতাম হাজী মোহাম্মদ মহসীন হলে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এই হলের কয়েক শত ছাত্রকে ওই মাঠটাতে একসাথে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরেছিল।’

‘কেন?’

‘কারণ পাকিস্তানি সামরিক শাসকেরা আমাদের বাংলাদেশটাকে গোলাম করে রাখতে চেয়েছিল। আর ছাত্রেরা যেহেতু তরুণ এবং পাকিস্তানিদের সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করত, সেহেতু ওদের গুলির শিকার হলো ওরাই প্রথম।’

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের সামনে এসে রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিলেন কাজল মামা। দু’দিন বাদেই মহান একুশে ফেরুয়ারি। মামা বললেন, ‘অন্ত এই পৃথিবীতে অসংখ্য অগণিত জাতি বা গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। ওদের মধ্যে যাঁরা স্বাধীন হয়েছেন তাঁদের সেই স্বাধীনতা লাভের পেছনে প্রচুর ত্যাগ-তিক্ষ্ণা আছে। অনেক রক্তের ইতিহাস আছে। হাজারো লক্ষ প্রাণদানের করুণ কাহিনি আছে। আর সেইসব রক্তের স্মৃতিকে ভবিষ্যতের বংশধরদের জন্য ধরে রাখতে গিয়েই দেশে এই শহিদ মিনারের মতো স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে।’

মামাকে বলে, ‘মামা এবাব কি তুমি ফুল দিতে আসবে শহিদ মিনারে?’

‘আসব। গ্রামে থাকি, অনেক বছর আসতে পারি নি। এবাব তোকে নিয়েই আসব। বলতো অন্ত, শহিদ মিনার বাঙালির স্মৃতিসৌধ কেন?’

‘মায়ের ভাষা বাংলাকে রক্ষা করতে গিয়ে এখানে অনেক বাঙালি প্রাণ দিয়েছিল একদিন।’

অন্তর স্পষ্ট উত্তরে কাজল মামা খুব খুশি হলেন। বললেন, ‘তুই তো বেশ কিছু জানিস অন্ত। তোর উত্তরে খুব খুশি হয়েছি আমি। এই শহিদ মিনার হলো আমাদের ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদদের স্মৃতির মিনার। পাকিস্তানের শাসকেরা আমাদের বাঙালিদের ওপর তাদের উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বাঙালিরা তা মেনে নেয় নি। তাই ১৯৫২ সালের একুশে ফেরুয়ারিতে ঠিক এই জায়গাটায় যখন তাঁরা উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিল তখনই পাকিস্তানি পুলিশ গুলি করে অনেককে হত্যা করেছে। চাপ চাপ রক্তে এই জায়গার মাটি ভিজে গেছে। ওই রক্তের বিনিময়েই আমরা বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি।’

অন্তর মুখ দেখে কাজল মামা বুবলেন সে মন খারাপ করেছে। মানুষ মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে এ ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না অন্ত। মামাকে বলে, ‘মামা, তুমি ও তখন এখানে ছিলে?’



‘নারে পাগল। আমি তো তখন তোর মতোই ছেট। এখানে যাঁরা বাহান সালে রঞ্জ দিয়েছেন তাঁরা সবাই আমার বড়। ওরা আমাদের পিতৃপুরুষ — ওদের আমরা চিরদিন মনে রাখব — শ্রদ্ধা করব।’

কাজল মামার হাত ধরে অন্ত একের পর এক সিঁড়ি ডিঙিয়ে শহিদ মিলারের ওপরে ওঠে। মামার কাছে একুশে ফেরুম্মারির কাহিনি শনে সে আগ্রহী হয় নিজ জাতির অভীত সংজ্ঞামের আরও কাহিনি শনতে। কেউ তো আগে এমন করে বলে নি তাকে। অথচ কত কাহিনি আছে বাঙালি জাতির। অন্ত বলে, ‘তুমি আমাকে আরও কাহিনি বলো মামা।’

‘একুশে ফেরুম্মারির দিন যখন মূল দিতে আসবি সেদিন আরও বলব। আজ শধু এটুকুই বলি — এই একুশে ফেরুম্মারির শহিদেরা হচ্ছে আমাদের জাতির অথম শহিদ। ওরা রঞ্জ দিয়েছিল বলেই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেয়েছিল। শধু তা-ই নয় একুশে ফেরুম্মারি থেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালিদের স্বাধীনতার মূল সংঘাম শুরু হয়। সেই সংঘাম আরও উনিশ বছর ধরে চলে। এই উনিশ বছরে অসংখ্য মানুষ মারা যায়, অনেক মারের কোল খালি হয়ে যায়। তারপর আসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ।’

‘সেই মুক্তিযুদ্ধে তুমি ছিলে?’

‘হ্যাঁ আমি ছিলাম সেই মুক্তিযুদ্ধে।’

‘বলতে হবে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের গল্প। বাসায় ফিরে দুপুরের খাবার খেয়েই বলবে। ঠিক তো?’

‘ঠিক।’

শহিদ মিলার থেকে নেমে কাজল মামা আর অন্ত জুতো পরে নেয়। ফিরে আসার সময় মামা বলেন, ‘অন্ত চল, আমরা দু’জনে এক মিনিট দাঁড়িয়ে একুশে ফেরুম্মারির শহিদের শ্রদ্ধা জানাই।’

অন্ত ও কাজল মামা মীরবে শ্রদ্ধা জানায়।

(সংক্ষেপিত ও পরিয়াজিত)

শক্তির ও টীকা

- হানাদার বাহিনী — অন্যায়ভাবে আক্রমণকারী বাহিনী। এখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বোঝাচ্ছে। এই বাহিনী বাংলার নিরীহ জনগণের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে।
- তিতিক্ষা — সহমন্তব্যতা।
- সামরিক শাসন — সামরিক বাহিনী দ্বারা যখন রাষ্ট্রের শাসন পরিচালিত হয় তখন সেই শাসনকে সামরিক শাসন বলা হয়।
- পিতৃপুরুষ — পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ প্রতি পূর্বপুরুষ।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশ, জাতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করা।

পাঠ-পরিচিতি

‘পিতৃপুরুষের গল্প’ গল্পটির কিশোর অন্ত ঢাকায় বসবাস করে। মাঝের কাছে মুক্তিযোদ্ধা কাজল মামার সাহসী সংগ্রামের গল্প শুনে অন্তর মনে মামার মুখ থেকে যুদ্ধের গল্প শোনার আগ্রহ জাগে। সে মামার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। এক সময় একুশে ফেরুজারির দুর্দিন আগে কাজল মামা ঢাকায় আসেন। মামার কাছেই শুরু হয় অন্তর অতীত সম্পর্কে তথ্যনির্ভর ইতিহাসের পাঠ। অন্ত জানতে পারে ঢাকা শহরের নামের ইতিহাস, সাতমসজিদ রাস্তার নামের ইতিহাস। জানতে পারে যুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের পার্থক্য। পঁচিশে মার্চের রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণ ও ছাত্রদের প্রতিবাদী ভূমিকার কথা। ঢাকা শহরে রিকশায় ঘুরতে ঘুরতে কিশোর অন্ত শৃতিসৌধ, মাতৃভাষা আন্দোলন, শহিদ মিনারসহ বাঙালি জাতির পিতৃপুরুষ কারা সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

লেখক-পরিচিতি

কথা সাহিত্যিক হারুন হাবীব একজন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা এবং ৭১ এর রণাঙ্গন সংবাদদাতা। তিনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে প্রচুর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা লিখেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি হলো: ‘প্রিয়যোদ্ধা’, ‘ছোটগল্পসমষ্টি ১৯৭১’, ‘মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত প্রবন্ধ,’ ‘Blood and Brutality’ ইত্যাদি। তাঁর জন্ম ১৯৪৮ সালে জামালপুরে।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনে আমাদের কী কী করা উচিত – ১০টি বাক্যে তা লেখ।
খ. তোমার গ্রাম/মহল্লার যেকোনো একজন মুক্তিযোদ্ধার সংক্ষিপ্ত জীবনী কমপক্ষে ১৫টি বাক্যে লেখ।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মোগল আমলে ঢাকার নাম ছিল

ক. বাবরনগর	খ. হুমায়ুননগর
গ. আকবরনগর	ঘ. জাহাঙ্গীরনগর

২. অন্তর নানা কাজলকে বকতেন কেন?

- ক. ভাষা আন্দোলনে যুক্ত থাকায়
- খ. গ্রামে চলে যাওয়াতে
- গ. মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে
- ঘ. চাকরি হয়নি বলে

নিচের উদ্দীপক পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

(১) “আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেরুয়ারি”

(২) “মুক্তির মন্দির সোপান তলে

কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অঞ্জলে ।”

৩. উদ্দীপকের প্রথম অংশটি ‘পিতৃপুরুষের গল্প’ গল্পের কোন দিকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

- i. ভাষা আন্দোলন
- ii. মুক্তিযুদ্ধ
- iii. ইতিহাস-ঐতিহ্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | | | |
|----|--------|----|-------------|
| ক. | i | খ. | ii |
| গ. | i ও ii | ঘ. | i, ii ও iii |

৪. উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশের মূলভাব নিচের কোন কথাটিতে প্রতিফলিত হয়েছে?

- ক. স্বাধীনতা এবার আসবেই
- খ. যুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে অনেক তফাও
- গ. অনেক রক্তের ইতিহাস আছে
- ঘ. ওরা আমাদের পিতৃপুরুষ

সূজনশীল প্রশ্ন

১. সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী প্রিয়তি বাবা-মায়ের সঙ্গে প্রথমবারের মতো ঢাকায় বেড়াতে এসেছে। একুশে ফেরুয়ারিতে বাবা-মা ওকে নিয়ে যায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে। বাবা-মায়ের সাথে সেও ফুল দিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। বাবার কাছে ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের কথা শুনে গর্বে মনটা ভরে ওঠে প্রিয়তির।

- ক. ১৯৭১ সালে কাজল মামা কোথায় পড়ত?
- খ. ‘যুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে অনেক তফাও’ – উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।
- গ. অন্ত ও প্রিয়তির মনোভাব কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ – ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি ‘পিতৃপুরুষের গল্প’ গল্পের সম্পূর্ণ ভাবকে ধারণ করে না’ – উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

ছবির রং হাতের খান



ছবি আৰকতে ইচ্ছে হচ্ছে?

কাগজ তো সাদা। পেপিলে আৰ্কা যায়। হাতের কলমটা দিয়েও আৰ্কা যায় এই সাদা জমিনে।

ৰং হলে শুড়ুব ভালো হয়। ইচ্ছে যতো লাল, মীল, সবুজ, বেগুনি, হলুদ, কালো রং ঘষে ঘষে সাদা কাগজটা ভৱে
কেলা যায়। সুন্দর এক রঙিন ছবি আৰ্কা হয়ে যায়।

হলুদ, মীল ও লাল এই তিনটিই কিছু আসল রং। এই তিনি রং থাকলে নানা রংে ভৱা পৱিত্ৰ রঙিন ছবি আৰ্কা যায়।
এই তিনটি রং মিলিয়ে মিলিয়ে অনেক রং পাওয়া যায়। যেমন —

হলুদ ও মীল মেশালে পাবে সবুজ।

মীল ও লাল মেশালে পাবে বেগুনি।

লাল ও হলুদ মেশালে পাবে কমলা।

এজাবে একটির সঙ্গে আৱেকটি রং বা একাধিক রং মিলিয়ে কত বুকম রং যে পাওয়া যায় তাৰ মধ্যে কয়েকটি রং ছাড়া
সবজলো সঠিক নামে চেলা সম্ভব নহ। তাই সিকাত হয়েছে — লাল, হলুদ ও মীল এই তিনটিই হলো মৌলিক রং বা
প্রাথমিক রং। সবুজ, কমলা ও বেগুনি হলো হিতীয় পৰ্যায়ের বা মাধ্যমিক রং এবং অন্যান্য রং পৰবর্তী পৰ্যায়ের।

সাদা ও কালো রং ছবি আৰকার ক্ষেত্ৰে শুবই কুণ্ডপূৰ্ণ। মৌলিক রং মিলিয়ে এই দুটো রং পাওয়া যাবে না।
তবে সবুজ ও লাল ঘন কৰে মিলিয়ে কালোৱা কাছাকাছি পাঢ় একটি রং তৈরি কৰা সম্ভব।

রংধনুর সাতটি রং । বৃষ্টির পর আকাশে যখন রংধনু ফুটে ওঠে একটি একটি করে গুণে সাতটি রং খুঁজে বের করা যায় । হলুদ, কমলা, লাল, সবুজ, নীল, বেগুনি ও গোলাপি ।

বাংলাদেশ ষড়খন্তুর দেশ । বছরের ১২ মাসকে আমরা ২ মাস করে প্রকৃতি ও আবহাওয়ার কারণে ভাগ করে নিয়েছি ।

বৈশাখ জৈষ্ঠ এই ২ মাস গ্রীষ্মকাল । আবহাওয়া থাকে শুক্র ও গরম । বৃষ্টি হয় কম । গাছপালা, খাল-বিল-নদী শুকিয়ে যায় । প্রচণ্ড রোদে গাছের সবুজ-সতেজ রং বিবর্ণ হয়ে যায় । আবার হঠাতে আকাশে কালো রঙের মেঘের ছুটাছুটি, বিদ্যুৎ চমকানো, সঙ্গে কানে তালালাগা প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হয় । তারপর ঝড় ও বৃষ্টি । প্রকৃতিতে রঙের নানা রকম খেলা চলে । রং-বেরঙের ফল — আম, জাম, কলা, লিচু, তরমুজ এই গ্রীষ্ম খন্তুতে পাওয়া যায় । লাল, নীল, কালো, হলুদ, গোলাপি, কমলা সবুজ রঙের এই বাহারি ফলগুলোর স্বাদও মিষ্টি ।

বর্ষাকাল হলো আষাঢ়-শ্রাবণ মাস । যিরবিরে অঞ্চল বৃষ্টি থেকে বার বার করে প্রবল বেগে বৃষ্টি হয় এ সময় । মাঠ-ঘাট-নদী নালা বিল-বিল পানিতে টুটুন্মুর । পানি পেয়ে গাছপালা সতেজ হয়ে যায় — নানা রকম সবুজ রঙে ভরে যায় গাছপালা, বন-জঙগল, ধানক্ষেত, পাটক্ষেত ইত্যাদি । সাদা ও কমলা রঙের কদম ফুল বর্ষা খন্তুর ফুল । এই খন্তুতে সতেজ ও সবুজ কচুবনে যখন কমলা রঙের লম্বা লম্বা ফুল ফোটে চমৎকার লাগে দেখতে । কচুফুল তরকারি হিসেবেও সুস্বাদু ।

শরৎকাল — সাদা ও স্বচ্ছ নীলের ছড়াছড়ি । ভদ্র ও আশ্বিন — এই দুই মাস শরৎকাল । এ সময়ে বৃষ্টি বসে যায় । সুন্দর নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো গুচ্ছ গুচ্ছ মেঘ ভেসে বেড়ায় । গাছপালা নদীনালা প্রকৃতির সবকিছু এই খন্তুতে বকবকে । নদীর ধারে ও বিলে অঞ্চল পানিতে কাদা মাটিতে সবুজ গাছ থেকে বের হয়ে আসে নরম সাদা কাশফুল । বাতাসের দোলায় এই কাশফুল যখন দোলে, সুন্দর নরম রঙের কারণে মন তখন আনন্দে নেচে ওঠে । বিলে, পুরুরে এ সময় শাপলাফুল ফোটে । বেশির ভাগ শাপলা সাদা, লাল শাপলাও আছে — যা দেখতে খুবই সুন্দর । ভরা নদী ও খালে সাদা, লাল, নীল ও হলুদ বিভিন্ন রঙের পালতোলা নৌকা-চলাচলের দৃশ্য মোহনীয় ।

হেমন্ত খন্তু হলো কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস । সবুজ ধানক্ষেতের রং হলুদ হতে শুরু করে । খন্তুর শেষ দিকে — অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে পুরো মাঠে হলুদ বা গেরুয়া রঙের বাহার । ধান পেকে গিয়েছে । চার্ষিরা দল বেঁধে ফসল কাটা শুরু করে ।

এরপরেই পৌষ ও মাঘ মাস — শীতকাল । বনে জঙগলে, বাড়ির আঙিনায় সর্বত্রই নানা রঙের ফুল ফোটা শুরু হয় । এই ফুল ফোটা শীতের পরে বসন্ত খন্তু পর্যন্ত চলতে থাকে । শিমুল, পলাশ আর কৃষ্ণচূড়া গাছে যখন ফুল ফোটে, হলদে গাছের ঝলমলে হলুদ রঙের ফুলে পুরো প্রকৃতি যেন রঙের উৎসবে মেঘে ওঠে । মাঠে তিলের ক্ষেতে সাদা ও হালকা বেগুনি ফুল এবং সরমের ক্ষেতে ফুলে ফুলে হলুদের বন্যা নামে এই শীতকালেই । শীতের কারণে মানুষের পোশাকে আসে রঙের বৈচিত্র্য । লাল, নীল, হলুদ, কালো বিচিত্র রঙের গরম কাপড় ও টুপি ব্যবহার করে মানুষ ।

শীতকালে কুয়াশাও প্রকৃতিতে খোঁয়াটে ধরনের এক মায়াবী রং আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। খুবই ঠাণ্ডা ও বরফ-পড়া দেশ থেকে চলে আসে আমাদের দেশে লক্ষ পাখি। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে এরা আশ্রয় নেয় আমাদের দেশের খালে বিলে নদীতে — যাদের বলা হয় অতিথি পাখি। রং-বেরঙের পালক এসব পাখির। শীতের শেষে বসন্তের শুরুতে এরা আবার চলে যায় নিজের দেশে।

ফাল্বন ও চৈত্র বসন্তকাল। ষড়খ্বতুর শেষ খাতু। এ সময় গাছে গাছে যেন প্রতিযোগিতা — কে কত সুন্দর ও সতেজ ফুল ফোটাতে পারে। নানা রঙের পালকে সেজে ছোটবড় সব পাখি গাছে গাছে নেচে বেড়ায়, উড়ে বেড়ায়। ফুলের মধু খেয়ে উড়ে বেড়ায় আনন্দে। অন্যদিকে হাজার লক্ষ রঞ্জিন প্রজাপতি। এত রং-বেরঙের যে হিসেব করা সম্ভব নয়। নানা রঙের মোহময় প্রেরণায় মানুষও স্বতুবসুলভ আনন্দে মেটে ওঠে। বাসন্তী ও উজ্জ্বল রঙের পোশাকে, সাজ-সজায় উৎসবে মেটে ওঠে। তাই বসন্ত খাতুই হলো রঙের খাতু।

অনেক কাল আগে থেকেই — বাংলাদেশের ষড়খ্বতুতে আমাদের পরিবেশে, নিসর্গে উজ্জ্বল-সুন্দর নানা রঙের যে সমাবেশ ঘটেছে — বুপের রকমফের ঘটে চলেছে — তা বাঙালির মনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। তাই আমরা দেখি আমাদের গ্রামীণ সমাজের লোকশিল্পীরা মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল, কাপড় ও তুলার পুতুল, সোনার পুতুল, লক্ষ্মীসরা, শখের হাঁড়ি, নকশিকাঁথা, হাতপাখা, পাটি, গল্ল বলার পটে তথা লোকশিল্পে উজ্জ্বল ও সতেজ রং ব্যবহার করে ছবি ও শিল্পকে সুন্দর ও মোহনীয় রূপ দিয়ে চলেছে।

তাঁতে তৈরি কাপড়ে তাঁতিরা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকেরা তাদের তৈরি তাঁতের পোশাকে রঞ্জিন সুতোর বুনটে নানা রঙের বালমলে মনকাড়া সব শাড়ি ও পোশাক বানিয়ে চলেছে। আমাদের শিশুরা এখন ছবি আঁকে। বিভিন্ন দেশের তুলনায় বাংলাদেশের শিশুদের ছবির রং অনেক উজ্জ্বল, সাহসী এবং মৌলিক রং যেষা। তাই খুব সহজেই বাংলার শিশুদের ছবিকে আলাদা বৈশিষ্ট্যে চেনা যায়।

চার়কলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাণ চিত্রশিল্পীদের ছবির সামনে দাঁড়ালে একই কথা মনে হবে। বাংলাদেশের শিল্পীরা অনেক মুক্ত সহজ ও সাহসী। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, বেগুনি, কমলা, কালো ও সাদা রংকে শিল্পীরা সুন্দরভাবে ছবিতে, নকশিকাঁথায়, হাতপাখায়, পুতুলে, হাঁড়িপাতিলে ব্যবহার করছেন। তাই বাংলার শিল্পীদের শিল্পকর্ম সারা বিশ্বে প্রশংসা পাচ্ছে।

শব্দার্থ ও টীকা

খুউব	-	খুব। জোর দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে খুউব।
মৌলিক রং	-	যার মধ্যে অন্য কোনো রঙের মিশ্রণ ঘটেনি। একটি মাত্র রঙে গঠিত।
ষড়	-	ছয়।
প্রচণ্ড	-	কড়া, কঠোর।
গেরুয়া	-	মেটে।
বাহার	-	শোভা, সৌন্দর্য।
সর্বত্র	-	সব জায়গায়।

পাঠের উদ্দেশ্য

ঝাতুভেদে প্রকৃতির বিচিৰ সৌন্দৰ্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করে তোলা।

পাঠ-পরিচিতি

আমৱা চারপাশে গাছ-লতাপাতা, ফুল, মাঠ, নদী পাহাড়-পৰ্বত ইত্যাদি দেখি। তাদের রূপ আছে। রং আছে। সেই রূপকে নানান রঞ্জে নিজেৰ মতো যঁৱা আঁকেন তাদেৱ আমৱা বলি চিৰশিল্পী। বিভিন্ন ঝাতুভেও আমাদেৱ চারপাশেৰ পৰিবেশেৰ রূপ ও রং বদলে যায়। চিৰশিল্পী তাও তাদেৱ ছবিতে রঞ্জ-ৱেখায় ফুটিয়ে তোলেন। ছবিৰ সেই নানান রং ও রঞ্জেৰ বৈচিত্ৰ্যেৰ কথাই লেখক হাশেম খান তাঁৰ ‘ছবিৰ রং’ লেখাটিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

লেখক-পরিচিতি

শিল্পী হাশেম খান ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপুৰ জেলায় জন্মগ্রহণ কৱেন। এশিয়া ও ইউরোপেৰ বিভিন্ন দেশে চিৰকলা বিষয়ে বাংলাদেশেৰ প্রতিনিধিত্ব কৱেছেন। বঙবন্ধু স্মৃতি জাদুঘৰৰ ও ঢাকা নগৰ জাদুঘৰৱেৰ তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ছবি আঁকাৰ পাশাপাশি তিনি সাহিত্যচৰ্চাও কৱেন। তাঁৰ উল্লেখযোগ্য বই : ‘ছবি আঁকা ছবি লেখা’, ‘জয়নুল গঞ্জ’, ‘গুলিবিজ্ঞ ৭১’।

কৰ্ম-অনুশীলন

- ক. প্ৰকৃতিনিৰ্ভৰ ছড়া, কৰিতা বা গল্প লিখে দেয়াল-পত্ৰিকা প্ৰকাশ (শ্ৰেণিৰ সকল শিক্ষার্থীৰ দলগত কাজ)।
- খ. প্ৰকৃতিনিৰ্ভৰ ছবি এঁকে প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন (শ্ৰেণিৰ সকল শিক্ষার্থীৰ দলগত কাজ)।
- গ. শ্ৰেণিৰ সকল শিক্ষার্থীকে নিয়ে সুন্দৰ হাতেৰ লেখা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন।

নমুনা প্ৰশ্ন

বহুনিৰ্বাচনি প্ৰশ্ন

১. ছবি আঁকাৰ মৌলিক রংগুলো কী ?
 - ক. হলুদ, সবুজ ও বেগুনি
 - খ. লাল, হলুদ ও কমলা
 - গ. লাল, নীল ও হলুদ
 - ঘ. হলুদ, নীল ও সবুজ
২. অগ্রহায়ণে মাঠে গেৱয়া বাহাৰ দেখে বোৰা যায়-
 - i. আকাশে রংধনু উঠেছে
 - ii. মাঠে ধান পেকেছে
 - iii. মানুষেৰ পোশাকে বৈচিত্ৰ্য এসেছে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

নিচের উদ্ধীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় বোনের সাথে বেড়াতে যায় সবিতা। সেখানে তার বোন তাকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ঘুরে ঘুরে দেখায়। হঠাৎ সবিতার চোখ ক্যাম্পাস সংলগ্ন বিলে আটকে যায়। সেখানে রং বেরঙের হাজার হাজার পাখির মেলা বসেছে। কিন্তু কোনো পাখিই তার পরিচিত নয়।

৩. উদ্ধীপকের অচেনা পাখিগুলো ছবির রং রচনায় উল্লিখিত কোন ঝাতুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ?

- | | | | |
|----|----------|----|----------|
| ক. | বর্ষাকাল | খ. | শরৎকাল |
| গ. | শীতকাল | ঘ. | বসন্তকাল |

৪. উদ্ধীপকে উল্লিখিত পাখিগুলোকে আমাদের দেশে কী বলে ?

- | | | | |
|----|--------------|----|---------------|
| ক. | মায়াবী পাখি | খ. | রংবেরঙের পাখি |
| গ. | বসন্তের পাখি | ঘ. | অতিথি পাখি |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. গত ডিসেম্বরে রিংকু তার মামার বাড়ি আলোকদিয়ায় বেড়াতে যায়। তার মা তাকে সেখানকার বিদ্যালয়ে নিয়ে যান। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নানা রঙের অনেক ফুল আর প্রজাপতি দেখে সে মুক্ত হয়। সেখানে সে শিক্ষার্থীদের তৈরি উজ্জ্বল রঙের নানা ধরনের পুতুল, বিভিন্ন রং দিয়ে আঁকা ছবি দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে।

- | | |
|----|--|
| ক. | চারীরা কোন মাসে দল বেঁধে ফসল কাটে? |
| খ. | ‘এ দেশের প্রকৃতি নানারূপে প্রতিফলন ঘটেছে।’ – বুঝিয়ে লেখ। |
| গ. | বিদ্যালয়ের দৃশ্যে কোন ঝাতুর পরিচয় পাওয়া যায়? |
| ঘ. | ‘বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তৈরি পুতুল ও আঁকা ছবিগুলো যেন আমাদেরই প্রকৃতি।’ – ‘ছবির রং’ প্রবন্ধের আলোকে এ উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। |

ଗୋକେହା ସାଧୀଓଡ଼ିଆ ହୋସେନ

ଶେଖିଲା ହୋସେନ



ଗୋକେହା ୧୮୮୦ ମୁଣ୍ଡରେ ଜେଲାର ପାଇସାବଳ ଏଥେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରେନ । ତୌର ପିତା ଅଛୀର ବୋହୁମଦ ଆବୁ ଆଲୀ ନାବେର ଅନ୍ତରେ କୁସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହିଲେନ । ପାଇସାବଳ ଏଥେ ତୌମେର ବାଢ଼ିଟି ହିଲ ବିଶାଳ । ସାତେ ତିନ ବିଦ୍ୟା ଅଧିଯେ ଯାବାନେ ହିଲ ତୌମେର ବାଢ଼ିଟି ।

ଗୋକେହା ସେ ସମେର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରେଇଲେନ ଦେ ସମେର ବାଙ୍ଗଲି ମୁଦ୍ଦମାନ ସମାଜେ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୟାମକ ଉଚ୍ଚଲ ହିଲ ନା । ଫଳେ ମୁଦ୍ଦମାନଙ୍କା ଲିଙ୍ଗ-ମୀଳା, ଚାକରି, ସାମାଜିକ ଅଭିଭାବ ମିକ ଥେବେ ପିଲିଯେ ହିଲ । ମେରେଦେର ଅବହାନ ହିଲ ଖୁବି ଶୋଚ୍ଚିର । ପର୍ମିଶ୍ରା କାଠୋରତାରେ ଯାନା ହତୋ ସବେ ମେରେଦେର ଶିକ୍ଷା ଲାଭେର କୋଳେ ସୁଯୋଗ ହିଲ ନା । କିନ୍ତୁ ମେଦ୍ଦାରୀ ଗୋକେହାର ଅବହ ହିଲ ଦେଖାଗଢ଼ାର ପତି ।

ଗୋକେହାର ବଢ଼ ଦୂଇ ଭାଇ କଳକାତାର ସେଟ୍ ଜେଡିର୍ସ କଲେଜେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେନ । ବୋଲଦେର ଅବହ ଦେବେ ବଢ଼ ଭାଇ ଇତ୍ତାଇମ ନାବେର ବୋଲ କରିଯୁଦ୍ଧରେ ଓ ଗୋକେହାକେ ଇହରେଇ ଶିକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷିତ କରେନ । କରିଯୁଦ୍ଧରେ ଅନୁଷ୍ଠାନବାୟ ଗୋକେହା ବାଲୀ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଓ ଚାରୀ ଆଶ୍ରୀ ହାତେ ଥାଟେନ । ଗୋକେହା ତୌର ରାଚିତ ‘ରାଜିତ୍ତ’ ରିଜୀଜ ଥଥ କରିଯୁଦ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚର୍ଜନକେ ଉଚ୍ଚର୍ଜ କରେଇଲେନ । ଉଚ୍ଚର୍ଜ-ଲାଙ୍ଘ ଭିନ୍ନ ଲିଖେଇଲେନ, ‘ଆପାଜାନ! ଆୟି ଶୈଶବେ ତୋଯାରଇ ମେହେର ଅସାଦେ ବର୍ଣ୍ଣପରିଚର ପଡ଼ିତେ ଶିଥି । ଅଗର ଆପ୍ତିରମ୍ପ ଆମାର ଟର୍ମ ଓ କାରାଲି ପଡ଼ାର କଷ ଆପଣି ମା କରିଲେଣ ବାଲାଲା ପଡ଼ାର ଘୋର ବିଦୋଧୀ ହିଲେନ । ଏକମାତ୍ର ତୃପ୍ତିର ଆମାର ବାଲାଲା ପଡ଼ାର ଅନୁକ୍ରମ ହିଲେ ।’ ନାନା ବାଧା ଏହିରେ ଗୋକେହା ଆପଣ ନାଥନାମ ବାଲା ଭାବାର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେହେଲେ । ତାଇ ଗୋକେହା ସାଧୀଓଡ଼ିଆ ହୋସେନ ଏକଜଳ ଅସାଧାରଣ ନାରୀ ।

১৮৯৮ সালে কিশোরী বয়সেই বিহারের ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে রোকেয়ার বিয়ে হয়। স্বামীর সহযোগিতায় তিনি তাঁর পড়াশোনার চর্চা চালিয়ে যান। বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯০২ সালে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত ‘নবপ্রভা’ পত্রিকায় ছাপা হয় তাঁর প্রথম রচনা ‘পিপাসা’। বিভিন্ন সময়ে তাঁর রচনা নানা পত্রিকায় ছাপা হতে থাকে। ১৯০৫ সালে প্রথম ইংরেজি রচনা ‘সুলতানাজ ড্রিম’ মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় ছাপা হয়। তাঁর রচনা সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

১৯০৯ সালে সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন মারা যান। রোকেয়া ভাগলপুরে তাঁর নামে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তখন স্কুলের ছাত্রী ছিল পাঁচ জন। ১৯১১ সালে এই স্কুলটি তিনি কলকাতায় স্থানান্তর করেন। শুরুতে ছাত্রীসংখ্যা ছিল আট। আস্তে আস্তে স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা বাঢ়তে থাকে।

রোকেয়া বাঙালি মুসলমান মেয়েদের শিক্ষিত করার জন্য শুধু স্কুলই প্রতিষ্ঠা করেন নি, ঘরে ঘরে গিয়ে মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য বাবা-মায়ের কাছে আবেদন-নিবেদন করেছেন। এই কাজে তিনি ছিলেন একজন নিরলস পরিশ্রমী কর্মী। তাঁর অক্রান্ত প্রচেষ্টার ফলে নারীশিক্ষার অগ্রগতি সৃষ্টি হয়। মেয়েরা ধীরে ধীরে শিক্ষার আলোর দিকে এগোতে থাকে।

১৯১৫ সালে তিনি ‘আগুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম’ নামে একটি মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে দুষ্ট নারীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করা হতো। তাদের হাতের কাজ শেখানো হতো, সামান্য লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থাও ছিল। এক কথায় এই সংগঠনটির লক্ষ্য ছিল সমাজের সাধারণ দুষ্ট নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলা।

রোকেয়ার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা পাঁচটি : ‘মতিচূর’ ১ম খণ্ড (১৯০৪), ‘সুলতানাজ ড্রিম’ (১৯০৮), ‘মতিচূর’ ২য় খণ্ড (১৯২২), ‘পদ্মরাগ’ (১৯২৪) ও ‘অবরোধবাসিনী’ (১৯৩১)।

রোকেয়া এই উপমহাদেশের একজন দূর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। নারীশিক্ষার অগ্রদূত হিসেবে সমগ্র বাঙালি সমাজের তিনি শুন্দেক। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় তিনি দুইভাবে নারীদের মুক্তির পথ দেখেছিলেন। এক. মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করে, দুই. নিজের রচনায় নারী মুক্তির দিক নির্দেশনা দিয়ে।

তিনি ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

শব্দার্থ ও টীকা

প্রভূত	-	প্রচুর।
ভূসম্পত্তি	-	জমিজমা।
সামাজিক প্রতিষ্ঠা	-	সমাজে গৌরবময় অবস্থান। সমাজে গণ্যমান্য হওয়া।
শোচনীয়	-	খুব দুঃখজনক।
প্রবল	-	প্রচণ্ড, তীব্র।
আগ্রহ	-	ইচ্ছা।
অনুপ্রেরণা	-	উৎসাহ, কোনো বিষয়ে কারও মধ্যে ইচ্ছা জাগানো।
খণ্ড	-	ভাগ, অংশ।

বৰ্ণপরিচয়	-	বাংলাভাষা শেখা শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যাসাগরের লেখা একটি বই।
বাঙালা	-	বাংলা। 'বাংলা' বোঝাতে বাঙালা শব্দটি একসময় ব্যবহার করা হতো। 'বাঙালা' শব্দটিই 'বাংলা'য় পরিণত হয়েছে।
অনুকূলে	-	পক্ষে।
নিরলস	-	যার অলসতা বা কুঁড়েমি নেই।
স্বাবলম্বী	-	স্ব — নিজ। যে নিজেই নিজের অবলম্বন।
দূরদৃষ্টিসম্পন্ন	-	দূরদৃষ্টি — দূরকে দেখার দৃষ্টি। এখানে দূর বলতে ভবিষ্যৎ কাল বোঝানো হয়েছে।
বিংশ	-	বিংশ বা কুড়ি।
অগ্রদূত	-	পথপ্রদর্শক।

পাঠের উদ্দেশ্য

নারীর কর্মজগতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা।

পাঠ-পরিচিতি

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বাংলাদেশের নারী-আন্দোলনের অগ্রদূত। বিংশ শতকের শুরুর দিকে যখন এদেশের নারীরা শিক্ষা-দীক্ষা ও সকল অধিকার থেকে বস্তি ছিল তখন তিনি প্রায় একক চেষ্টায় মেয়েদের শিক্ষার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর এই আন্দোলনের হাতিয়ার ছিল কলম — লেখালেখি। একটি শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান পরিবারের সদস্য ছিলেন তিনি। কিন্তু তারপরও অনেক প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে তাঁকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়েছে। ফলে নারীশিক্ষার প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে তিনি ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। এই পটভূমিতেই তিনি তাঁর লেখালেখির জগতকে যৌক্তিক ও শাণিত করে তোলেন। ফলে অনিবার্যভাবেই নারীমুক্তির আন্দোলনে তাঁর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও গল্পকার সেলিনা হোসেন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস লক্ষ্মীপুর জেলা। সেলিনা হোসেনের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো : 'জলোচ্ছাস', 'হাঙ্গর নদী প্রেনেড', 'মগ্ন চৈতন্যে শিস', 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি', 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প' ইত্যাদি।

কর্ম-অনুবীক্ষন

- ক. শিক্ষার্থীরা তার দেখা একজন নারীর (মা, বোন, শিক্ষিকা প্রমুখ) কর্মজগৎ নিয়ে রচনা লিখবে (একক কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বেগম রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত প্রথম স্কুলটি কতজন ছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করে ?

- | | | | |
|----|------|----|------|
| ক. | তিনি | খ. | পাঁচ |
| গ. | সাত | ঘ. | নয় |

২. বেগম রোকেয়ার সময়ে বাঙালি মুসলমান সমাজের অবস্থা ছিল —

- i. অনংসর
- ii. পশ্চাত্পদ
- iii. স্বাভাবিক

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | | | |
|----|--------|----|----------|
| ক. | i | খ. | ii |
| গ. | i ও ii | ঘ. | ii ও iii |

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায় আমেনার। বাড়ির সবার আপত্তি সত্ত্বেও লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী আমেনাকে তার শ্বশুর স্কুলে ভর্তি করে দেন। শ্বশুরের সহযোগিতায় লেখাপড়া শেষ করে প্রতিষ্ঠিত হন আমেনা। এরপর গ্রামের অন্য মেয়েদেরকেও শিক্ষিত হয়ে কাজ করতে আগ্রহী করে তোলেন।

৩. আমেনার শ্বশুরের সঙ্গে ‘রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন’ প্রবক্ষের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য আছে?

- ক. ইব্রাহীম সাবেরের
- খ. জহির মোহাম্মদ আবু আলী সাবের
- গ. সাখাওয়াত হোসেন
- ঘ. করিমুল্লেসার

৪. বেগম রোকেয়া এবং আমেনার মূল লক্ষ্য ছিল, নারী সমাজের —

- i. স্বাবলম্বন
- ii. শিক্ষা
- iii. সাহিত্য রচনা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | | | |
|----|---------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | ii ও iii |
| গ. | i ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

শরীফা ও নীলা দুজনেই মানব সেবায় নিয়োজিত। শরীফা খুঁজে খুঁজে অসহায় মেয়েদের ক্ষুলে ভর্তি করিয়ে দেন। শত বাধা এলেও এ বিষয়ে তিনি আগোস করেন নি। অন্যদিকে নীলা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কয়েকটি সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। সেখানে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষকে, রোগ, দুঃখ ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কাজ করেন।

- ক. বেগম রোকেয়া কার অনুপ্রেরণায় সাহিত্য রচনায় আঘাতী হয়ে উঠেন ?
- খ. বেগম রোকেয়ার সময়ে নারীর অবস্থা কেমন ছিল? বুঝিয়ে লেখ ।
- গ. শরীফার কাজে বেগম রোকেয়ার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর ।
- ঘ. মানব সেবার ক্ষেত্রে নীলা ও বেগম রোকেয়ার ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনা কর ।

সেই ছেলেটি

মামুনুর রশীদ



১য় ক্ষণ্ণ্য :

(খোদের পাশ দিয়ে থাজে সোয়েদ, সাবু ও আরজু। সবাই গাল পাইতে পাইতে কুলে থাজে। বেশ ভাঙ্গা ভাসের। একসময় হঠাতে খেয়ে থাই আরজু। তরো আরজুকে ফেলেই চলে যায়। আরজুর ব্যথা পারে। সাবু কিনে আসে।)

- | | | |
|----------------|---|---|
| সাবু | - | কী হলো আবার? |
| আরজু | - | আমি বে আর হাঁটতে পারছি না। |
| সাবু | - | জোজ জোজ তোর জন্য আমি স্যারের বকুলি খেতে পারব না। |
| আরজু | - | ঠিক আছে তোরা বা, আমি একই ধক্কনি যাব। |
| সাবু | - | বাক ভাবলে।
(চলে যাই সাবু। আরজু বলে গত্তে। এ সময়ই ঐ গথ দিয়ে যাচ্ছিল এক আইসক্রিমওয়ালা।) |
| আইসক্রিমওয়ালা | - | আইসক্রিম, আইসক্রিম চাই আইসক্রিম। কী হলো আরজু মিয়া, ফুমি এখানে বলে কী করছু? |
| আরজু | - | কিনু না। |
| আইসক্রিমওয়ালা | - | কুলে থাবে না? |
| আরজু | - | না। |

- আইসক্রিমওয়ালা - স্কুলে ফাঁকি দেওয়া কিন্তু খুব খারাপ, আমিও খুব স্কুল ফাঁকি দিতাম। আমার অবস্থা দ্যাখো। যদি লেখাপড়াটা করতাম তাহলে কি আর আইসক্রিম ফেরি করতে হতো? যাও স্কুলে যাও। চাই আইসক্রিম, আইসক্রিম।
- আরজু - ভাই শোন — তুমি কোন দিকে যাচ্ছ?
- আইসক্রিমওয়ালা - আমি তো যাব এই বাজারের দিকে।
- আরজু - আজ স্কুলের দিকে যাবে না? আইসক্রিম খাব, টিফিন পিরিয়ডের সময় —
- আইসক্রিমওয়ালা - ক্লাস যখন চলে তখন তো আর আইসক্রিম বিক্রি হয় না। আমার বাজারের সময় চলে যায়। চাই আইসক্রিম। (আইসক্রিমওয়ালা চলে যায়। হাওয়াই মিঠাইওয়ালার প্রবেশ।)
- আরজু - ভাই শোনো।
- হাওয়াই মিঠাইওয়ালা - শুধু শুধু ডাকছ কেন? এভাবে সময় নষ্ট হলে আমার হাওয়াই মিঠাই যে শূন্যে মিলিয়ে যাবে।
- আরজু - তোমার হাওয়াই মিঠাই কি মেঘের মতো যে, মেঘ জমছে আর শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছ।
- হাওয়াই মিঠাইওয়ালা - হ্যাঁ, মেঘের চাইতেও অনেক হালকা — তাই তো মিলিয়ে যায়। যাই — চাই হাওয়াই মিঠাই (চলে যায়)।
- আরজু - এখন আমি কী করব? বাড়ি গেলে বাবা বলবে স্কুলে ফাঁকি দেওয়ার মতলব —
- স্কুলে গেলে স্যার বলবে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।
- এখন কী হবে?

২য় দৃশ্য :

(টিফিনের ঘণ্টা বাজে। সোমেন, সাবু ও আরও ছেলে-মেয়েরা টিফিন পিরিয়ডে বেরিয়ে আসছে। তারা খেলছে। এ সময়ে আসেন শিক্ষক লতিফ স্যার।)

- লতিফ স্যার - এই সাবু, এদিকে শোন — আচ্ছা আরজুকে দেখছি না যে?
- সাবু - স্যার মাঝপথে এসে আরজু বলল তোরা যা। এরকম মাঝে মাঝেই করে আরজু।
- লতিফ স্যার - কিন্তু কেন করে?
- সাবু - এমনিই।
- লতিফ স্যার - এমনিই মানে? ইচ্ছে করে? না কি কোনো সমস্যা আছে ওর?
- সাবু - জানি না স্যার।
- লতিফ স্যার - আচ্ছা। এই যে সোমেন, এদিকে শোনো, তোমার কী মনে হয় আরজু কি ইচ্ছে করেই স্কুল কামাই করছে?
- সোমেন - স্যার, ওর যে কী হয়? হঠাত করে বলে আমি আর যেতে পারছি না, তোরা দাঁড়া। তখন ওয়ার্নিংবেল বেজে গেছে। আর কি দাঁড়াতে পারি? তাই তো চলে আসি, সেটাই ভালো না স্যার?
- লতিফ স্যার - কোথায় যেন একটা সমস্যা মনে হচ্ছে।
- মিঠু - স্যার এ ছেলেটার সাথে আমারও দেখা হয়েছে।
- লতিফ স্যার - কোথায়?
- মিঠু - এ যে পলাশতলীর আমবাগানের ওখানে বসে আছে। আমার সাথে নানান কথা।

- লতিফ স্যার
মির্তু
- লতিফ স্যার
সোমেন
- লতিফ স্যার
সাবু
- নানা কথা? তাহলে স্কুলে এলো না কেন?
 - একসময় বলল তুমি কি স্কুলের দিকে যাবে? আমি বললাম না — এখন বাজারে যাব। তারপর টিফিন পিরিয়ডের দিকে স্কুলের দিকে যাব।
 - তাহলে তো খুবই চিন্তার কথা। আচ্ছা ঐ আমবাগানে কি এখনও আছে?
 - মনে হয় এতক্ষণে বাড়ি চলে গেছে।
 - তোমরা চলো তো —
 - স্যার (ওদের চোখে মুখে অনিচ্ছা। হাওয়াই মিঠাইওয়ালা হেঁকে চলছে—হাওয়াই মিঠাই। লতিফ স্যার ওদের দুইজনকে নিয়েই রওয়ানা দেন।)

৩য় দৃশ্য :

(আমবাগান। অসহায় আরজু বসে আছে। একা সে উঠে দাঁড়ায়। একটা পাখি ডাকছে। তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছে সে।)

- আরজু
- পাখি, একটু নিচে নাম না। তোমার সাথে কথা কই। আমাকে স্কুলে নিয়ে যাবে? সাবু, সোমেন ওরা কেউ নিয়ে গেল না। তুমি নিয়ে যাও না! তোমার ডানায় ভর করে চলে যাব। কী হলো? নেমে গেলে কেন? মেঘ আমায় নিয়ে যাও না। তোমার কোলে বসে চলে যাব স্কুলে। কী বলছো? ভিজে যাব? ভিজলাম। আবার শুকিয়ে যাব — তবুও তো স্যার বুঝবেন, ছেট পাখি চন্দনা, এই যে শালিক আমাকে দেখতে পাচ্ছ না? আমি একলা বসে আছি। আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। আমার সাথে কথা বল না — চন্দনা আমায় নিল না, মেঘ আমায় নিল না — শালিক আমার সাথে কথা বলে না।

(আরজু কাঁদতে থাকে। হঠাৎ উপস্থিত হয় লতিফ স্যার।)

- লতিফ স্যার
সোমেন
- লতিফ স্যার
আরজু
- লতিফ স্যার
আরজু
- আরজু
- লতিফ স্যার
আরজু
- লতিফ স্যার
সোমেন
- লতিফ স্যার
সোমেন
- লতিফ স্যার
সোমেন
- লতিফ স্যার
- আরজু, তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কী হয়েছে? তুমি স্কুলে যাও নি কেন?
 - কাঁদিস কেন? স্যারকে বল না। (আরজু কাঁদছেই)
 - কোনো ভয় নেই, বল।
 - স্যার, আমি বেশি দূর হাঁটতে পারি না। পা দুটো অবশ হয়ে আসে।
 - তোমার বাবা-মাকে বল নি কেন?
 - বলেছি — বাবা বলেন হাঁটা-হাঁটি করলেই ঠিক হয়ে যাবে।
 - তোমার পা দুটো দেখি — এ তো রোগ, তোমার পা চিকন হয়ে গেছে।
 - মা জানে, সেই ছেটবেলায় কী যেন অসুখ হয়েছিল সেই থেকেই পাটা চিকন — মা বোবে কিন্তু কাঁদে শুধু।
 - তোমরা খেয়াল কর নি?
 - না স্যার।
 - তোমাদের বক্স না?
 - জী স্যার।
 - তোমার যদি এরকম হতো?
 - আমরা বুঝতে পারি নি স্যার। এরকম বুঝলে আমরা দুজনে ধরে এইভাবে নিয়ে যেতাম। (দুজনেই কাঁধে হাত দিয়ে ওকে তুলে ফেলে।)
 - বলো স্কুলে যাবে? না কি বাড়ি যাবে?

- স্কুলে স্যার। (ওদের কাঁধে হাত তুলে আরজু স্কুলে যায়।)
- লাতিফ স্যার
- চলো। দেখি তোমার চিকিৎসার জন্য আমরা কী করতে পারি।

শব্দার্থ ও টীকা

- | | | |
|------------|---|---|
| সেই ছেলেটি | - | ‘সেই ছেলেটি’ নামক এই লেখাটি একটি নাটিক। এটি এ বইয়ের আর সব লেখার মতো নয়। এতে কয়েকজন বিশেষ জায়গায় থেকে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। এ ধরনের রচনা কেবল পড়ার জন্য নয়। এগুলো মধ্যে অভিনয় করে লোককে দেখানো হয়। এ ধরনের লেখা বড় পরিসরে থাকলে তাকে বলে নাটক। |
| দৃশ্য | - | নাটক বা নাটিকায় বিষয়গুলোকে ঘটনাস্থল অনুসারে ভাগ করে নেওয়া হয়। এক-একটি ঘটনাস্থলকে ‘দৃশ্য’ বলা হয়। ‘সেই ছেলেটি’ নাটিকার তিনটি ঘটনাস্থলকে তিনটি দৃশ্যে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। ১য় দৃশ্য — গ্রামের পাশের রাস্তা। ২য় দৃশ্য — সাবু, আরজুদের স্কুল। ৩য় দৃশ্য — আমবাগান। |
| মতলব | - | উদ্দেশ্য বা ফন্দি। |

পাঠের-উদ্দেশ্য

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (শারীরিক ও মানসিকভাবে সুবিধাবণ্ণিত) শিশুদের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি।

পাঠ-পরিচিতি

নাট্যকার মামুনুর রশীদ রচিত ‘সেই ছেলেটি’ একটি নাটিক। এ নাটিকাটিতে একটি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (শারীরিক ও মানসিকভাবে সুবিধাবণ্ণিত) শিশুর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। একই সাথে প্রকাশ পেয়েছে শিশুর প্রতি বড়দের মমত্ববোধ। আরজু, সোমেন ও সাবু তিনি বস্তু একই স্কুলে একই শ্রেণিতে পড়ে। কিন্তু বিদ্যালয়ে হেঁটে আসতে আরজুর খুব কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে তার পা অবশ হয়ে আসে। বস্তুদের সাথে সমান তালে চলতে পারে না। কখনো কখনো বসে পড়ে। বস্তুরা আরজুর জন্যে আস্তে আস্তে হাঁটে। তাতে স্কুলে যেতে দেরি হয়ে যায় এবং ওরা শিক্ষকের কাছে বকুনি খায়। আসলে হয়েছিল কি, আরজু ছেটবেলায় ভীষণ অসুখে পড়েছিল। তাতে তার পা সরু হয়ে যায়। কিন্তু আরজু জানে না কেন তার পা অবশ হয়ে আসে। তার মা জানেন আরজুর অসুখের কথা। তিনি কাঁদেন।

একদিন স্কুলে যাওয়ার পথে পা অবশ হয়ে গেলে, আরজু বস্তুদের স্কুলে চলে যেতে বলে। সে রাস্তার পাশে বসে থাকে। আইসক্রিমওয়ালা আসে, হাওয়াই মিঠাইওয়ালা আসে। সে তাদের সাথে কথা বলে। তারা চলে যায়। আরজু ভাবে পাখি কিংবা মেঘ তাকে যদি উড়িয়ে নিয়ে স্কুলে দিয়ে যেত।

এদিকে শিক্ষক লাতিফ স্যার আরজুকে ক্লাসে না দেখে সোমেনদের কাছ থেকে ঘটনাটি জেনে সোমেনদের সঙ্গে নিয়ে আরজুর খৌজে রওয়ানা হন। আরজুকে দেখে তিনি বুঝতে পারেন যে আরজুর পা অবশ হয়ে আসা একটা রোগ। তখন লাতিফ স্যারের কথায় সোমেনদের মনে সহানুভূতি জাগে। তাদের সহায়তায় আরজু স্কুলে যায়।

লেখক-পরিচিতি

মামুনুর রশীদ বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাট্যকার, অভিনেতা ও নির্দেশক। তিনি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক হলো : ‘ওরা কদম আলী’, ‘ওরা আছে বলেই’, ‘ইবলিশ’, ‘গিনিপিগ’, ইত্যাদি।

কর্ম-অনুশীলন

১. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য পোস্টার, প্ল্যাকার্ড, ব্যানার তৈরি করে র্যালির আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর কাজ)।
২. নাটিকাটি অভিনয় করে প্রদর্শনের ব্যবস্থা কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সেই ছেলেটি নাটিকায় দৃশ্য সংখ্যা কয়টি?

ক. দুইটি	খ. তিনটি
গ. চারটি	ঘ. পাঁচটি
২. আরজু তার বন্ধুদের সাথে স্কুলে যেতে যেতে বসে পড়ে কেন?

ক. সে স্কুলে যেতে চায় না	খ. স্যার তাকে বকুনি দিতে পারে
গ. তাঁর স্কুল ফাঁকি দেওয়ার ইচ্ছা ছিল	ঘ. রোগের কারণে সে হাঁটতে পারে না
৩. ‘মা বোবে কিন্তু কাঁদে’ কারণ -

ক. ছেলের পা চিকন হয়ে যাচ্ছে	খ. ছেলের পা একদিন পঙ্গু হয়ে যেতে পারে
গ. ছেলের পায়ের কোনো চিকিৎসা হচ্ছে না	ঘ. ছেলের এই অবস্থায় তিনি অসহায়

উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রেবেকা কাছের জিনিস দেখতে পায় কিন্তু— দূরের জিনিস বাপসা দেখে। একদিন সে লক্ষ করল দূরের বাপসা জিনিস অর্ধেক দেখা যাচ্ছে আর অর্ধেক পুরো অঙ্ককার। মাকে জানালে তিনি বললেন চোখে পানি দিলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। বরং অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে।

৮. রেবেকা কোন ধরনের শিশু?

ক. স্বাভাবিক	খ. পুষ্টিহীন
গ. সুবিধাবণ্ডিত	ঘ. বুদ্ধিহীন
৯. সেই ছেলেটি নাটিকা অনুযায়ী রেবেকার প্রয়োজন-
 - i. মাতা পিতার সহানুভূতি
 - ii. সমাজের সহানুভূতি
 - iii. স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ধারণা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | | | |
|----|---------|----|----------|
| ক. | i | খ. | i ও ii |
| গ. | i ও iii | ঘ. | ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আবিদ স্যার ৭ম শ্রেণির ছাত্র রওশনের কাছে তার স্কুলে অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলে সে কিছু না বলে চুপ থাকে। শ্রেণির অন্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করলে তারা প্রায় একযোগে বলে — স্যার, রওশন প্রায়ই স্কুল কামাই করে। শিক্ষক রওশনকে বলেন-আর কামাই করবে? কোনো উত্তর দেয় না রওশন। পায়ের বৃক্ষাঙ্গুলি দিয়ে মেঝে খুঁড়তে থাকে। উভর না পেয়ে শিক্ষক রওশনকে অনেক বকা দেন। কয়েকদিন পর রওশনের বাবা আবিদ স্যারকে বলেন-স্যার, রওশনের স্নায়ু রোগ আছে। নিয়মিত স্কুল করলে ওর অসুখটা বেড়ে যায়। বকাবকা করলে ওর স্কুলে আসা বন্ধ হয়ে যাবে।
- ক. যিরু আরজুকে কোথায় বসে থাকতে দেখেছে?
- খ. আইসক্রিমওয়ালা আরজুকে স্কুল ফাঁকি দিতে নিষেধ করল কেন? বুঝিয়ে লেখ।
- গ. রওশন ও আরজুর মধ্যকার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. আবিদ স্যারের বিচার কাজটি লতিফ স্যারের তুলনায় কতটুকু যৌক্তিক হয়েছে তা মূল্যায়ন কর।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসম্পত্তি

এ. কে. শেরাম

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি এই বাংলাদেশ বহু জাতি, বহু ভাষা ও বহু সংস্কৃতির একটি দেশ। এখানে প্রধান জনগোষ্ঠী বাঙালির পাশাপাশি রয়েছে প্রায় অর্ধশত ক্ষুদ্র জাতিসম্পত্তি। তেমনি দেশের প্রধান ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার পাশাপাশি রয়েছে অনেক ভাষা এবং ঐসব জাতিগোষ্ঠীর নানা বর্ণের বিচিত্র সংস্কৃতিও। তারপরও আমরা সবাই জাতীয়তার পরিচয়ে এক এবং দেশকে ভালোবাসার ক্ষেত্রেও ঐক্যবদ্ধ। বৈচিত্র্যের মধ্যেও এই যে একতার শক্তি এটিই আমাদের বাংলাদেশকে সুন্দর ও বর্ণময় করে তুলেছে।

বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসম্পত্তির সংখ্যা নিয়ে ভিন্ন মত রয়েছে। তবে সাধারণভাবে এই সংখ্যা ৪৬টি বলে অনুমিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের বিভিন্ন পাহাড়ি জনপদ ছাড়াও দেশের সমতলভূমি যেমন কক্রাবাজার, পটুয়াখালি, বরগুনা, ময়মনসিংহ, জামালপুর, টঙ্গাইল, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর ও সিলেট অঞ্চলে প্রধানত এদের বসতি। এইসব জনগোষ্ঠী শত শত বৎসর ধরে এই ভূখণ্ডে বসবাস করছে। তাদের প্রায় প্রত্যেকেই রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর কাছে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি খুবই প্রিয়।

বাংলাদেশে যেসব সংখ্যাবন্ধু জাতিসম্পত্তির বাস তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাঁওতাল, মণিপুরি, খাসি, শ্রো, রাখাইন, হাজং, তৎঙ্গ্যা, বম, কোচ, পাহাড়িয়া, রাজবংশী, মালো, ওরাও ইত্যাদি। এদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতির পরিচয় সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

চাকমা

মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত চাকমাদের প্রধান বসতি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায়। নিজেদের মধ্যে তারা ‘চাঙমা’ নামে পরিচিত। তারা আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের নিজস্ব হরফও আছে। চাকমারা পিতৃতান্ত্রিক। পিতাই পরিবারের প্রধান। চাকমা সমাজের প্রধান হলেন রাজা। গ্রামের প্রধান হলেন কারবারি। গ্রামের যাবতীয় সমস্যা তিনিই নিষ্পত্তি করেন। চাকমারা প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তবে তার পাশাপাশি এখনও তারা কিছু কিছু প্রকৃতিপূজাও করে থাকে। চাকমা পুরুষেরা ‘ধূতি’ ও মহিলারা ‘পিনন’ পরিধান করে থাকে। পুরুষেরা নিজেদের তাঁতে তৈরি ‘সিলুম’ (জামা) পরে। মেয়েরা ‘খাদি’কে ওড়না হিসেবে ব্যবহার করে।

চাকমাদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ, মাংস ও শাক-সবজি। চাকমা জীবনের নানা পর্যায়ে বিভিন্ন লোকিক আচার অনুষ্ঠান থাকে। বিয়ের সময় ছেলের অভিভাবককে ঘটকসহ কনের বাড়িতে কমপক্ষে তিনবার যাওয়া-আসা করতে হয়। প্রতিবার চুয়ানি, পান-সুপারি ও পিঠা নিয়ে যেতে হয়। বিজু উৎসব চাকমাদের একটি প্রধান উৎসব। চৈত্রের শেষ দুইদিন ‘ফুলবিজু’ ও ‘মূলবিজু’ এবং পহেলা বৈশাখকে ‘গর্যাপর্যায়া’ বলে আখ্যায়িত করে থাকে তারা। লোকনৃত্যগীত হিসেবে ‘জুমনাচ’ ও ‘বিজুনাচ’ বেশ জনপ্রিয়।

গারো

গারো জনগোষ্ঠীর প্রধান বসতি ময়মনসিংহ, টঙ্গাইল ও সিলেট অঞ্চলে। মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত গারোরা মাতৃসূত্রীয়। মেয়েরা পরিবারের সম্পত্তির মালিক হয়। বিবাহের পর বর স্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে বসবাস করে থাকে। সন্তান-সন্তিরা মায়ের পদবি ধারণ করে। তবে পরিবার, সমাজ পরিচালনা ও শাসনে পুরুষেরাই দায়িত্ব পালন করে থাকে। একই গোত্রে বিবাহ গারো সমাজে নিষিদ্ধ। গারোদের নিজস্ব ধর্ম আছে। এটি এক ধরনের প্রকৃতি পূজা।

গাঁরোরা প্রধানত কৃষিজীবী। গাঁহাড়ে বসবাসকারীরা জুম চাষ করে। আর সমতলভূমির গাঁরোরা নারী ও পুরুষ একসাথে সাধারণ নিয়মে কৃষিকাজ করে। গাঁরোরা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি জীবনের নানা পর্যায়ে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। অলকারণ ব্যবহার করে থাকে। গাঁরো সংস্কৃতিতে শীতবাদ্য ও নৃত্য খুবই উন্নতপূর্ণ। তাদের নিজস্ব কিছু বাদ্যযন্ত্রও আছে। ফসল বোনা, নবাহা, নববৰ্ষ ইত্যাদি উপলক্ষে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন হয়। ‘ওরানগালা’ গাঁরোদের একটি জনপ্রিয় উৎসব।

মারমা

মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত মারমাদের প্রধান বসতি পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে। মারমা ভাষাও মঙ্গোলীয় ভাষা পরিবারের। তাদের নিজস্ব বর্গমালাও আছে। মারমারা প্রাচীনকাল থেকেই বৌজ ধর্মাবলম্বী। তারা বিনের সময় ধর্মীয় ও লোকাচার মিলিনে নানা অনুষ্ঠান পালন করে। নিজেদের পোত্রে বিবাহকে মারমা সমাজে উৎসাহিত করা হয়। মারমারা শিত্তান্তিক। সম্পত্তির উন্নয়নাধিকারে ছেলে ও মেয়েদের সমান অধিকারের কথা বলা আছে। তবে পরিবার ও সমাজজীবনে পুরুষেরই প্রাথান্য থাকে। বিনের পর নারী-পুরুষ ইচ্ছে করলে মা-বাবার বাড়ি কিংবা শুশুরবাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে। মারমাদের সামাজিক শাসনব্যবস্থার রাজা প্রধান। মারমারা জুম চাষ করে এবং বনজ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহ করে।

বৌজ ধর্মাবলম্বী হলোও মারমারা এখনও বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা এবং নানা আচার-অনুষ্ঠানাদি পালন করে। তাদের সবচেয়ে বড় উৎসব হলো নববৰ্ষে সাধারণ দেবীর পূজা এবং এ উপলক্ষে আয়োজিত সাধারণ উৎসব তিন দিন ধরে চলে।

মণিপুরি

বাহ্লাদেশের সুন্দ জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে মণিপুরি জাতি অন্যতম। এদের আদি নিবাস ভারতের মণিপুর রাজ্য। এদের মধ্যে কোনো কোনো সম্প্রদায়ের নিজস্ব বর্গমালাও আছে। মণিপুরিরা বেধানেই বসতি স্থাপন করে সেখানে কয়েকটি গরিবার মিলে গড়ে তোলে পাঢ়া। প্রতিটি পাঢ়াতেই থাকে দেবমন্দির ও মঙ্গল। এই মন্দির ও মঙ্গলকে দিয়েই আবর্তিত হয় এই পাঢ়ার যাবতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ড। মণিপুরি সমাজে পাঢ়া বা গ্রাম ও ‘পানচায়’ বা পঞ্চায়তের ভূমিকা খুবই উন্নতপূর্ণ।



নৃত্যরত মণিপুরি

মণিশুরি জনগোষ্ঠী সাতটি গোত্রে বিভক্ত। মণিশুরিদের থাটীন ধর্মের নাম ‘আপোকপা’। তবে মণিশুরিদের অধিকাংশই এখন সন্তান ধর্মের চৈতন্যবৃত্তের অনুসারী। মণিশুরিদের একটি উচ্চাখণ্ড অংশ ইসলাম ধর্মাবলবী। সন্তান ধর্মাবলবী মণিশুরিদের প্রধান উৎসব রাস উৎসব, মধ্যমাহ ইজ্যাদি। রাস উৎসব উপলক্ষে রাসনৃত্য ও মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। মণিশুরিদের প্রধানত কৃবিজীবী। তাত, যাছ, শাক-সবজি মণিশুরিদের প্রধান খাদ্য। মণিশুরি পুরুষদের সাধারণত ধূতি, পায়ষ, জামা ইজ্যাদি পরিধান করে। আর মেয়েরা পরে নিজেদের তৈরি বিশেষ পরিধেয় পুরনের পোশাক।

বিপুরা

পার্বত্য চট্টগ্রামের ধাপড়াছড়ি, রামগাঁক, রাঘামাটি, কাঙাই এবং চট্টগ্রাম জেলা, বৃহস্পর্শ কুমিল্লা, নোবাখালি ও সিলেট অঞ্চলে বসবাসকারী মিশুরা জনগোষ্ঠী মঙ্গলীয় মহাজাতির অংশ। তাদের ভাষার নাম ‘ককবরক’। এদের নিজস্ব কোনো বর্ণমালা নেই। মিশুরা সমাজব্যবস্থা পিছুতাত্ত্বিক। হলেরাই সম্পত্তির উত্তোলিকারী হয়। মিশুরারা বর্তমানে সাধারণতাবে সন্তান হিন্মু ধর্মাবলবী। কিন্তু তারা এখনও তাদের থাটীন গোকুল ধর্মের নামা দেব-দেবীর পূজা অর্চনা এবং বিত্তিন অনুষ্ঠানাদি করে।

মিশুরা যেয়েরা কাপড় বরনে খুবই দক। তারা নিজেদের পরিনের কাপড় নিজেরাই তাঁতে তৈরি করে। পুরুষদের পরিধান করে নিজেদের তৈরি পায়ষ ও ধূতি। মিশুরারা কৃবিজীবী। তারা পাহাড়ে ঝুঁম চাষ করে। মিশুরাদের সংগীত ও নৃত্য খুবই সমৃদ্ধ। তাদের মধ্যে বিত্তিন সংগীতের অঙ্গে বেশন আছে, তেমনি আছে নানা ধর্কারের নৃত্যও। মিশুরাদের প্রধান উৎসব নববর্ষ বা বৈসু। মিশুরা জনগোষ্ঠীর ‘বৈসু’, মারমাদের ‘সাহাই’ ও চাকমাদের ‘বিজু’ উৎসবের অন্য অক্ষর নিয়ে ‘বৈসাবি’ উৎসব এখন নববর্ষ উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতীয় উৎসব।

সৌওতাল

সৌওতাল জনগোষ্ঠীর লোক প্রধানত উভয়বৰ্ষ ও সিলেটের ঢা বাগানে বসবাস করে। তাদের ভাষা অক্ষুক পরিবারের। সৌওতাল সরাজ পিছুতাত্ত্বিক। সম্পত্তির মালিকানায় এবং সমাজ ও পরিবারে পুরুষই প্রধান। সৌওতালদের নিজস্ব ধর্ম আছে। কিন্তু কোনো ধর্মগ্রহ নেই। পেশার দিক থেকে সৌওতাল জনগোষ্ঠী প্রধানত সুই ভাগে বিভক্ত — কৃষক ও শিথিক। অলেকের জন্যে কৃষি যেহেন প্রধান জীবিকা তেমনি অলেকে আবার শিথিক হিসেবে বিত্তিন জারণায় কাজ করে থাকে। প্রিচ্ছ-বিত্তোরী বারীনতা আলেকালনে সৌওতালদের সংস্থায়ী সুমিকা বিশেষ করে ‘সৌওতাল বিত্তোর’ ও ‘নাচোল কৃষক বিদ্যার’ ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে।



সৌওতাল মৃত্য

সাঁওতালরা খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। বাড়িস্থর লেপে মুছে পরিষ্কার রাখা হয় এবং দেয়ালে নানা রঙ দিয়ে ছবি আঁকা হয়। ‘সোহরাই’ হচ্ছে সাঁওতাল সমাজের শ্রেষ্ঠ উৎসব। এটা অনেকটা পৌষ-পার্বণের মতো। সাঁওতাল নৃত্যে মেয়ে-পুরুষ দলবদ্ধ হয়ে নাচে। তাদের ঝুমুর নাচ খুবই জনপ্রিয়।

বাংলাদেশের এইসব স্কুদ্র নৃত্যিক জাতিসভার জীবন ও সংস্কৃতি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে — বর্ণিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করেছে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নেও রয়েছে তাদের বিরাট অবদান। তারা আজ জাতীয় মূলধারারই অংশ।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

- স্কুদ্র জাতিসভা** — বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ হচ্ছে বাঙালি। বাঙালি ছাড়া আরও কিছু স্কুদ্রতর জনগোষ্ঠী বা জাতি আছে, যারা ভাষা, সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতির দিক থেকে বাঙালিদের মতো নয়। এ সকল জাতিসভার এক-একটিকে বলা হয়েছে স্কুদ্র জাতিসভা। যেমন : চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, হাজং, ত্রিপুরা ইত্যাদি।
- সংস্কৃতি** — ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের আত্মপরিচয় পাওয়া যায় এমন সব বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় সংস্কৃতি। বাঙালির কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলোর দ্বারা বাঙালিকে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী থেকে আলাদা করা যায়। তেমনি স্কুদ্র জাতিসমূহের সংস্কৃতিও আলাদা আলাদা। তবে নাগরিকত্বের পরিচয়ে বাংলাদেশের সকলেই এক ও অভিন্ন।
- আর্যভাষা** — ইউরোপে প্রথম উত্তর ঘটেছে এমন একটি প্রধান ভাষাগোষ্ঠীর নাম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠী। তার একটি শাখার নাম আর্য ভাষা। এই আর্য ভাষা থেকে বাংলা, হিন্দি ওড়িয়া, চাকমা প্রভৃতি ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।
- পিতৃতাত্ত্বিক**
- পরিবার** — মানব সমাজে দুরক্ষের পরিবার প্রথার সৃষ্টি হয়েছে; (ক) পিতৃতাত্ত্বিক, (খ) মাতৃতাত্ত্বিক। পরিবারের প্রধান নেতৃত্ব, অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও সম্পত্তি যদি পুরুষের হাতে থাকে তাহলে সে রকমের পরিবারকে বলা হয় পিতৃতাত্ত্বিক পরিবার। আর যে পরিবার প্রথায় উক্ত নেতৃত্ব ও ক্ষমতা নারীর হাতে থাকে, তাকে বলা হয় মাতৃতাত্ত্বিক। বাঙালিদের মতো চাকমাদের পরিবার পিতৃতাত্ত্বিক। তবে একালে মাতৃতাত্ত্বিক পরিবারেও পিতৃতাত্ত্বিক পরিবারের প্রভাব পড়েছে।
- খাদি** — হাতে কাটা (মেশিনে নয়) সুতা দিয়ে তৈরি কাপড়।
- লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান** — স্থান ও জাতি বিশেষের ঐতিহ্যগত আচার-অনুষ্ঠান যার মধ্যে বর্তমান নাগরিক রূচির প্রভাব পড়ে নি, তাকে লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান বলা হয়।
- মাতৃসুন্তীয় পরিবার** — কিছু সমাজ আছে যেখানে পুরুষগণ সমাজ পরিচালনা ও শাসনের অধিকারী হলেও নারীদের পরিচয়েই পরিবার পরিচিত হয়। এ ধরনের পরিবারকে মাতৃসুন্তীয় পরিবার বলে। যেমন : গারো পরিবার।
- পদবি** — উপাধি, যা নামের শেষে যোগ করে বৎস পরিচয় দেওয়া হয়। পদবি বলতে কর্মক্ষেত্রে স্তর বা মর্যাদাও বোঝায়।

- জুম — পাহাড়ে চাষাবাদের বিশেষ পদ্ধতি।
- মঙ্গোলীয় ভাষাগোষ্ঠী — একটি ভাষাগোষ্ঠী; এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রতিটি ভাষার আলাদা রূপ ও বৈশিষ্ট্য আছে।
- মণ্ডপ — পূজা বা সভা-সমিতির জন্য ছাদযুক্ত চতুর।
- বয়ন — বোনা।

পাঠের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।

পাঠ-পরিচিতি

বাংলাদেশে মূল জনগোষ্ঠী হচ্ছে বাঙালি জাতি। বাঙালি ছাড়াও এদেশে আরও অনেক জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বাস করে। ক্ষুদ্র এই জাতিসম্পত্তির মধ্যে আছে চাকমা, গারো, মারমা, মণিপুরি, ত্রিপুরা, সাঁওতাল প্রভৃতি জনগোষ্ঠী।

ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রত্যেকটিরই রয়েছে স্বতন্ত্র পরিচয়, নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবনাচার। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে কয়েকটি সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। চাকমা, গারো, মারমা, মণিপুরি, ত্রিপুরা ও সাঁওতালদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত এই আলোচনা বৃহত্তর জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে বলে ধারণা করা যায়।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও জীবনাচার আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে, করেছে বৈচিত্র্যময় ও বর্ণিল। দেশের সামষ্টিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহ শুরুত্তপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

লেখক পরিচিতি

বাংলাদেশে মণিপুরি সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ কবি ও প্রাবন্ধিক এ. কে. শেরাম। তাঁর জন্ম ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে হবিগঞ্জে। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রস্তুত হলো : ‘বসন্ত কুন্তি পালগী লৈরাঁ’, ‘মণিপুরি কবিতা’, ‘চৈতন্যে অধিবাস’, ‘মনিদীপ্তি মণিপুরি ও বিষ্ণুপ্রিয়া বিতর্ক’ ইত্যাদি।

কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার এলাকার বিভিন্ন লোকজ-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিচয় দিয়ে একটি রচনা লেখ (একক কাজ)

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর উৎসব কোনটি?

- | | |
|-----------|-----------|
| ক. সাংগীত | খ. বিজু |
| গ. বৈসু | ঘ. সোহরাই |

২. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসভার জাতীয় মূলধারারই অংশ কারণ, তারা-

- i. আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে
- ii. জাতীয় সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে
- iii. ধর্মীয় দিক থেকেও তারা গুরুত্বপূর্ণ

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. iii ও i | ঘ. i, ii ও iii |

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাবার চাকরির সুবাদে সুমি সিলেটের একটি ক্ষুলে ভর্তি হয়। সেখানে লুসি দাড়িং নামে একটি মেয়ের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়। কথা প্রসঙ্গে সুমি জানতে পারে ‘দাড়িং’ লুসির মায়ের পদবি। শুনে তার কাছে অস্তুত লাগে যে বিয়ের পর লুসির বাড়িতেই তার বর চলে আসবে।

৩. উদ্দীপকে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রজাতিসভা রচনার কোন জাতিসভার পরিচয় পাওয়া যায় ?

- | | |
|----------|------------|
| ক. চাকমা | খ. মারমা |
| গ. গারো | ঘ. সাঁওতাল |

৪. উদ্দীপকের জাতিসভা আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ, তারা আমাদের-

- i. সংস্কৃতির ধারক
- ii. অবিচ্ছেদ্য অংশ
- iii. ঐতিহ্যকে ধারণ করেছে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১। বাহার তার বক্স সঞ্জীবের সাথে একটি পার্বত্য অঞ্চলে বেড়াতে যায়। সেখানে শিয়ে সে জানতে পারে স্থানীয় লোকজন সবাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, পিতৃতাত্ত্বিক। তারা দেব-দেবীর পূজা করে এবং নববর্ষ এলে সাংগ্রাহ উৎসব পালন করে। সেখানে কয়েকদিন থাকার পর তারা অন্যত্র বেড়াতে যায়। সেখানকার সমাজের প্রধান হলেন রাজা। গ্রামের প্রধান হলেন কারবারি। সেখানে পুরুষেরা ধূতি ও মহিলারা ‘পিনন’ পরিধান করে থাকে। পুরুষেরা নিজেদের তৈরি ‘সিলুম’ পরে। মেয়েরা খাদিকে ওড়না হিসেবে ব্যবহার করে।

- ক. চাকমারা পহেলা বৈশাখকে কী বলে আখ্যায়িত করে?
- খ. পথঝায়েতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ — কেন?
- গ. উদ্দীপকের প্রথম স্থানটি ‘বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসভা’ রচনার কোন জাতিসভাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. শেষ স্থানটি বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র জাতিসভার বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। উদ্দীপক ও রচনার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

নতুন দেশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

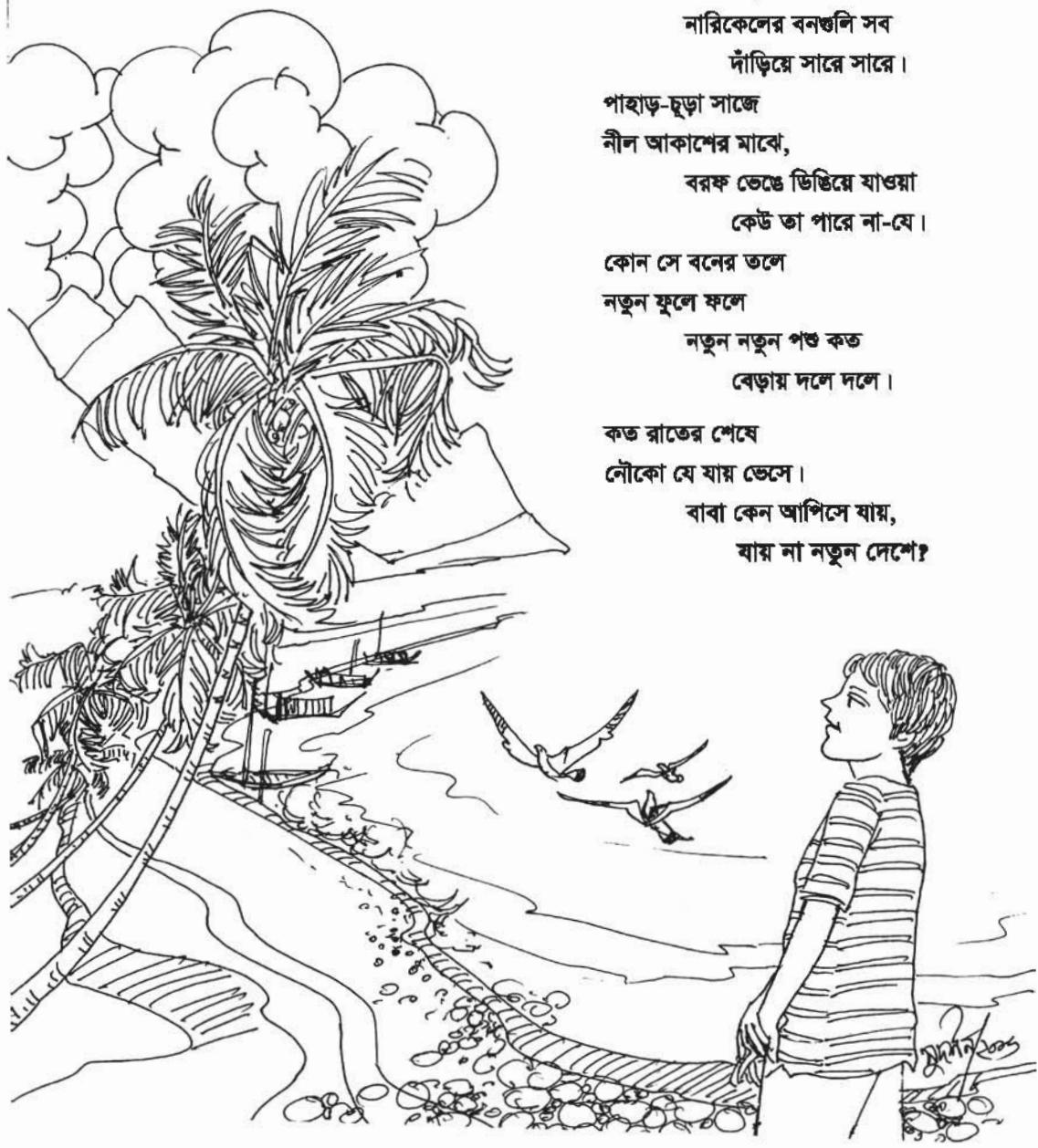
নদীর ঘাটের কাছে
লৌকো বাঁধা আছে,
নাইতে যখন যাই, দেখি সে
জলের ঢেউয়ে নাচে।
আজ গিরে সেইখানে
দেখি দূরের পানে
মাঝনদীতে লৌকো, কোথায়
চলে ভাঁটার টানে।
জানি না কোন দেশে
গৌছে ঘাবে শেষে,
সেখানেতে কেমন মানুষ
থাকে কেমন বেশে।



থাকি ঘরের কোণে,
সাথ জাগে মোর মনে,
অমনি করে বাই ভেসে, ভাই,
নতুন নগর বনে।

দূর সাগরের পারে,
জলের ধারে ধারে,
নারিকেলের বনশপি সব
দাঁড়িয়ে সারে সারে।
পাহাড়-চূড়া সাজে
নীল আকাশের মাঝে,
বরফ ভেঙে ডিঙিয়ে যাওয়া
কেউ তা পারে না-যে।
কোন সে বনের তলে
নতুন ফুলো ফলে
নতুন নতুন পশু কত
বেড়ায় দলে দলে।

কত রাতের শেষে
লৌকো যে যায় ভেসে।
বাবা কেন আপিসে যায়,
যায় না নতুন দেশে?



শব্দার্থ ও টীকা

- ভাঁটা — চাঁদ ও সূর্যের শক্তির আকর্ষণে সমুদ্র বা নদীতে বেড়ে উঠা জলের কমে যাওয়াকে বলা হয় ভাঁটা।
- আপিস — অফিস শব্দের একটি কথ্য রূপ।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসা, কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতা জগ্নিত করা।

পাঠ-পরিচিতি

কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সহজ পাঠ’ গ্রন্থের প্রথম ভাগ থেকে নেওয়া হয়েছে। এ কবিতায় অজানাকে জানার সীমাহীন কৌতুহল এবং প্রকৃতির সকল রহস্য উন্মোচন করার অপার আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশিত হয়েছে। ভাঁটার টানে ঘাটে বাঁধা নৌকা মাঝ নদী পেরিয়ে কোথায় গিয়ে যে পৌঁছবে তার কোনো ঠিক নেই। হয়তো কোনো নতুন দেশে বা নতুন পরিবেশে গিয়ে সে পৌঁছবে। এ সব প্রশ্নের উত্তর জানতে কৌতুহল জাগবে যে কারোরই। হয়তো কোনো অসীম সৌন্দর্য বা অজানা আনন্দ বা অপার বিস্ময় তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। অজানার প্রতি এই ব্যকুলতা শিশুরা তার আশপাশের সবার মধ্যেও দেখতে চায়।

কবি-পরিচিতি

এশীয়দের মধ্যে যিনি প্রথম মোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বসভায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি হলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ৭ই মে (২৫এ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় জোড়াসাঁকের বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রুলে নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর হয় নি। সতেরো বছর বয়সে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন। সে-পড়া শেষ না হতেই দেশে ফিরে আসেন তিনি। কিন্তু স্বশিক্ষা ও সাধনায় একক অবদানে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এত সমৃদ্ধ করেছেন যে যার কোনো তুলনা নেই। কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সংগীত সাহিত্যের সকল শাখা তাঁর আক্ষর্য অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ ও চিত্রকলাতেও তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন।

অনন্যসাধারণ তাঁর প্রতিভা। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, চিত্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, সুরকার, গীতিকার, নাট্যকার, নাট্যপ্রযোজক ও অভিনেতা। শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তিনি শিক্ষায় নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের একটি দেশপ্রেমমূলক গান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। রবীন্দ্রনাথের লেখা গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর বিভিন্ন রচনা সংকলিত হয়েছে ‘কৈশোরক’ নামে একটি গ্রন্থে।

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্ট (২২এ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

- তোমার কল্পনার দেশের একটি বর্ণনা প্রস্তুত কর।
- তোমার এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা দাও।
- সর্বশেষ তুমি যে অঞ্চলে ভ্রমণ করেছ তার বর্ণনা লেখ।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জলের ধারে কী দাঁড়িয়ে আছে ?

ক. নতুন নগর	খ. পাহাড় ছড়া
গ. নারিকেল বন	ঘ. নতুন পশ্চ
২. “অমনি করে যাই ভেসে, ভাই / নতুন নগর বনে।”
—এখানে কী প্রকাশ পেয়েছে ?

i. অসীম সৌন্দর্য	ii. অজানা আনন্দ
iii. অপার বিস্ময়	

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপরে
একটি শিশির বিলু।

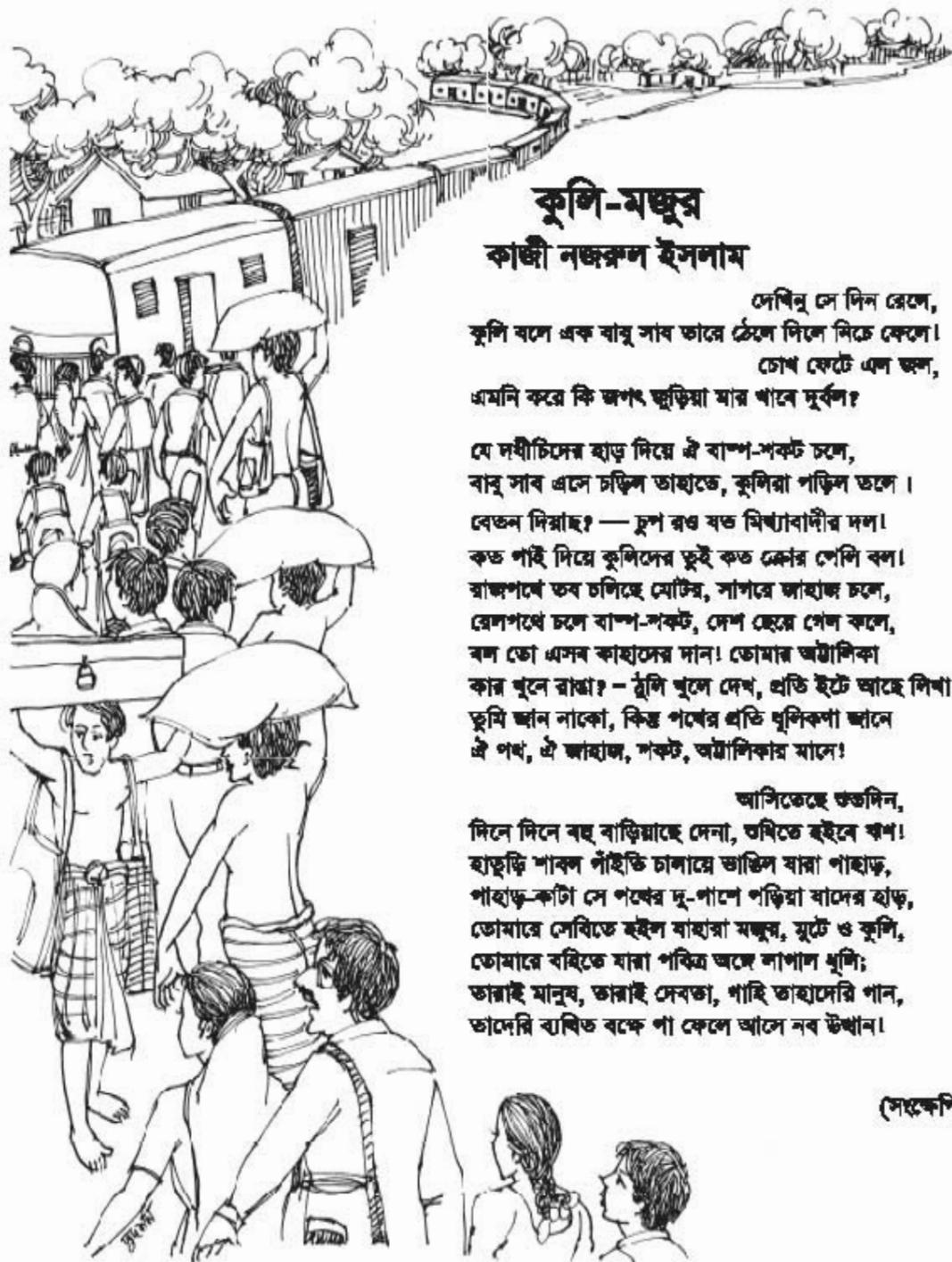
৩. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘নতুন দেশ’ কবিতার কোন দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ ?

ক. সীমাহীন কৌতুহল	খ. প্রকৃতির রহস্য
গ. অজানাকে জানা	ঘ. অপার আকাঙ্ক্ষা
৪. উক্ত দিকটি ‘নতুন দেশ’ কবিতার কোন অংশে প্রতিফলিত হয়েছে ?

ক. জানি না কোন্ দেশে / পৌছে যাব শেষে	খ. থাকি ঘরের কোণে / সাধ জাগে মোর মনে
গ. পাহাড়-ছড়া সাজে / নীল আকাশের মাঝে	ঘ. দূর সাগরের পারে / জলের ধারে ধারে

সূজনশীল প্রশ্ন

১. শীতের ছুটিতে বাবা-মায়ের সঙ্গে হাদিতা বেড়াতে যায় সেন্টমার্টিন দ্বীপে। সেখানকার সামুদ্রিক প্রবাল, সারি সারি নারিকেল গাছ, মাছ ধরার বড় বড় নৌকা ওর মনে কৌতুহল জাগায়। দিগন্ত বিস্তৃত নীলাভ জলরাশি, পরিষ্কার আকাশ ওকে নিয়ে যায় অন্য এক জগতে। ওর ইচ্ছে হয় সমুদ্রের নানা রঙের মাছের সঙ্গে খেলা করতে – আবার কখনো বা আকাশে পাখি হয়ে উড়ে বেড়াতে।
 ক. নীল আকাশের মাঝে কী সাজে?
 খ. ‘থাকি ঘরের কোণে’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
 গ. হাদিতার সেন্টমার্টিনে দেখা দৃশ্যে ‘নতুন দেশ’ কবিতায় চিত্রিত কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. “উদ্দীপকটি যেন ‘নতুন দেশ’ কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে আছে।”— উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।



কুলি-মজুম কাজী নজরুল ইসলাম

দেখিবু দে দিল ভেলে,
কুলি বলে এক বাবু সাব তারে ঠেঙে দিলে শিকে দেলে।
চোখ কেটে এল জল,
এমনি করে কি অগং কুড়িয়া যার ধারে দুর্বল?

যে সাধীচিদের হাত দিয়ে ঈ বাঞ্চ-শব্দট ছলে,
বাবু সাব এলে চাপ্পিল তাহাতে, কুলিয়া পাপ্পিল তলে।
বেতন দিয়াছ? — চুপ রও ষত খিল্লিবানীর দল।
কত গাই দিয়ে কুলিদের ফুই কত জেনের পেলি বল।
চাকপর্বে তব তলিহে মোটির, সাগরে জাহাজ ছলে,
বেলগথে ছলে বাঞ্চ-শব্দট, দেশ ছেরে গেল বলে,
বল তো এসব কাহাদের দান! তোমার আঠালিকা
কার খুনে রাখা? — কুলি খুনে দেখ, প্রতি ইটে আছে শিখ।
কুমি জান নাকো, কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে
ঐ পথ, ঈ জাহাজ, শব্দট, আঠালিকার যাদে!

আসিকেহে উভদিন,
দিলে দিলে বহু বাড়িয়াছে দেনা, পথিতে বইনে শখ!
হাতুড়ি শাবল গাইতি চালায়ে ভাঙিল বারা পাহাড়,
পাহাড়-কঠি সে পথের দু-গালে পড়িয়া যাদের হাফ,
তোমারে সেবিতে হইল বাহারা মজুম, যুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পরিত অহে লাখাল খৃষি;
তারাই যানুব, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরি ব্যবিত বক্ষে গা কেলে আসে নব উর্ধান।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টাকা

দধীচি	-	ভারতীয় পুরাণে উল্লেখিত একজন ত্যাগী মুনি। এ কবিতায় শ্রমজীবী কুলি-মজুরদের দধীচিমুনির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যে শ্রমজীবী মানুষেরা সভ্যতার বিস্তারে শ্রম দিয়ে সাহায্য করেছেন তারাই আজ অবহেলিত। তাদের শ্রমের ওপর ভর করে যারা ধনী হয়েছেন, তারাই সকল সুবিধাভোগী। কবি দুঃখ করে ত্যাগী দধীচির সঙ্গে ত্যাগী কুলি-মজুরের তুলনা করেছেন।
বাঞ্চ-শকট	-	‘শকট’ মানে গাঢ়ি। বাঞ্চ-শকট হচ্ছে বাঞ্চ দ্বারা চালিত গাঢ়ি। এখানে রেলগাড়ি।
পাই	-	মুদ্রার একক বিশেষ। এ কবিতায় ‘পাই’ বলতে কুলি-মজুরদের মজুরির ‘স্বল্পতা’ বোঝানো হয়েছে।
ক্রোর	-	কোটি।
ঠুলি	-	চোখের ওপর ঢাকনি। গরুকে যখন ঘানিতে জোড়া হতো, তখন তার চোখে ঢাকনি পরানো হতো। ঐ ঢাকনির নাম ‘ঠুলি’। ‘ঠুলি খুলে’ মানে সচেতন হয়ে।
অট্টালিকা	-	প্রাসাদ, অন্য কথায় সুউচ্চ দালান বা ইমারত।
‘দিনে দিনে বছ	-	
বাড়িয়াছে দেনা’	-	অতীতকাল থেকে মানব সভ্যতা শ্রমজীবী মানুষদের অবদানে অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু প্রতিদানে তাঁরা পেয়েছেন অল্পই।
শাবল	-	লোহার তৈরি মাটি খোঁড়ার হাতিয়ার।
গাঁইতি	-	পাথর, ইট প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত কঠিন স্থান খোঁড়ার জন্য লাঙ্গলের আকারের দুয়ুখো কুড়াল।
বক্ষে	-	বুকে।
নব উথান	-	কোনো ভালো কাজের জন্য নতুন করে উদ্যোগী হওয়া।

পাঠের উদ্দেশ্য

বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা।

পাঠ-পরিচিতি

কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের ‘সাম্যবাদী’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। ‘কুলি-মজুর’ কবিতায় কবি মানবসভ্যতার যথার্থ রূপকার শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের পক্ষে কলম ধরেছেন।

যুগ যুগ ধরে কুলি-মজুরের মতো লক্ষকোটি শ্রমজীবী মানুষের হাতে গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা। এদেরই অক্লান্ত শ্রমে ও ঘামে মোটর, জাহাজ, রেলগাড়ি চলছে। গড়ে উঠেছে দালানকোঠা, কলকারখানা। এদের শোষণ করেই ধনিকশ্রেণি হয়েছে বিভ-সম্পদের মালিক। কিন্তু যুগ যুগ ধরে সমাজে এই কুলি-মজুররাই সবচেয়ে বংশিত ও উপেক্ষিত। এক শ্রেণির হন্দয়হীন স্বার্থান্ত্র মানুষ এদের শ্রমের বিনিময়ে পাওয়া বিভ-সম্পদের সবটুকুই ভোগ করছে অর্থাত এদের তারা মানুষ হিসেবে গণ্য করতেও নারাজ।

লেখক-পরিচিতি

অন্যায়, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বিপ্লব ও দেশপ্রেমের উদ্দীপনাময় কবিতা লিখে বাংলার জনমনে যিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে নদিত আসন পেয়েছেন, তিনি কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

বহু বিচ্ছিন্ন ও বিস্ময়কর তাঁর জীবন। ছেলেবেলায় লেটোর দলে গান করেছেন, রুটির দোকানের কারিগর হয়েছেন, সেনাবাহিনীর হাবিলদার হয়ে যুক্তে যোগ দিয়েছেন, ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে রাজন্দেহের অপরাধে কারাবরণ করেছেন। তিনি পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সংগীত প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

তিনি যে শুধু বড়দের জন্য লিখেছেন তা নয়, ছোটদের জন্য লেখা তাঁর কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে — ‘বিশেঙ্গুল’, ‘সপ্তরয়ন’, ‘পিলে পটকা’, ‘সুম জাগানো পাখি’, ‘সুম পাড়ানি মাসিপিসি’ এবং নাটক ‘পুতুলের বিয়ে’।

নজরুলের কবিতা ও গান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তাঁর রচিত ‘সন্ধ্যা’ গ্রন্থের অন্তর্গত ‘চলু চলু চলু’ গানটি আমাদের রণ-সংগীত। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

নজরুলের জন্য ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে।

তিনি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট (১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ১২ই ভাদ্র) ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. তোমার দেখা বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের একটি তালিকা প্রণয়ন কর (দলীয় কাজ)।
- খ. তোমার দেখা একজন শ্রমজীবী মানুষের জীবন-যাপনের উপর একটি বিবরণী লেখ (একক কাজ)।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কাজী নজরুল ইসলামের মতে কোনটিতে দেশ হেয়ে গেল ?
 - ক. মোটরে
 - খ. জাহাজে
 - গ. কলে
 - ঘ. রেলগাড়িতে
২. ‘কুলি-মজুর’ কবিতায় কবি শ্রমজীবীদের জয়গান গেয়েছেন কারণ তারা —
 - i. অবহেলিত
 - ii. সভ্যতার নির্মাতা
 - iii. অধিকারবঞ্চিত

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বৰৰ বলি যাহাদেৱ গালি পাড়িল ক্ষুদ্ৰমনা,
কৃপমণ্ডক ‘অসংযমীৰ’ আখ্যা দিয়াছে যাবে,
তাৰি তৱে ভাই গান রচে যাই, বন্দনা কৱি তাৱে ।

৩. কবিতাংশেৰ ক্ষুদ্ৰমনা' কুলি-মজুৱ কবিতায় বৰ্ণিত কোন অংশেৰ প্রতিনিধিত্ব কৱে ?

- | | | | |
|----|------------|----|---------------|
| ক. | বাবুসাবদেৱ | খ. | মিথ্যাবাদীদেৱ |
| গ. | দৰীচিদেৱ | ঘ. | কুলি-মজুৱদেৱ |

৪. কবিতাংশেৰ মূলভাব 'কুলি-মজুৱ কবিতার নিচেৰ কোন চৰণে প্রতিফলিত হয়েছে ?

- | | |
|----|---|
| ক. | দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে খণ |
| খ. | তাৱাই মানুষ, তাৱাই দেবতা, গাহি তাৰাদেৱ গান |
| গ. | তাৰেই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান |
| ঘ. | তোমারে বহিতে যাবা পৰিত্ব অঙ্গে লাগাল ধূলি |

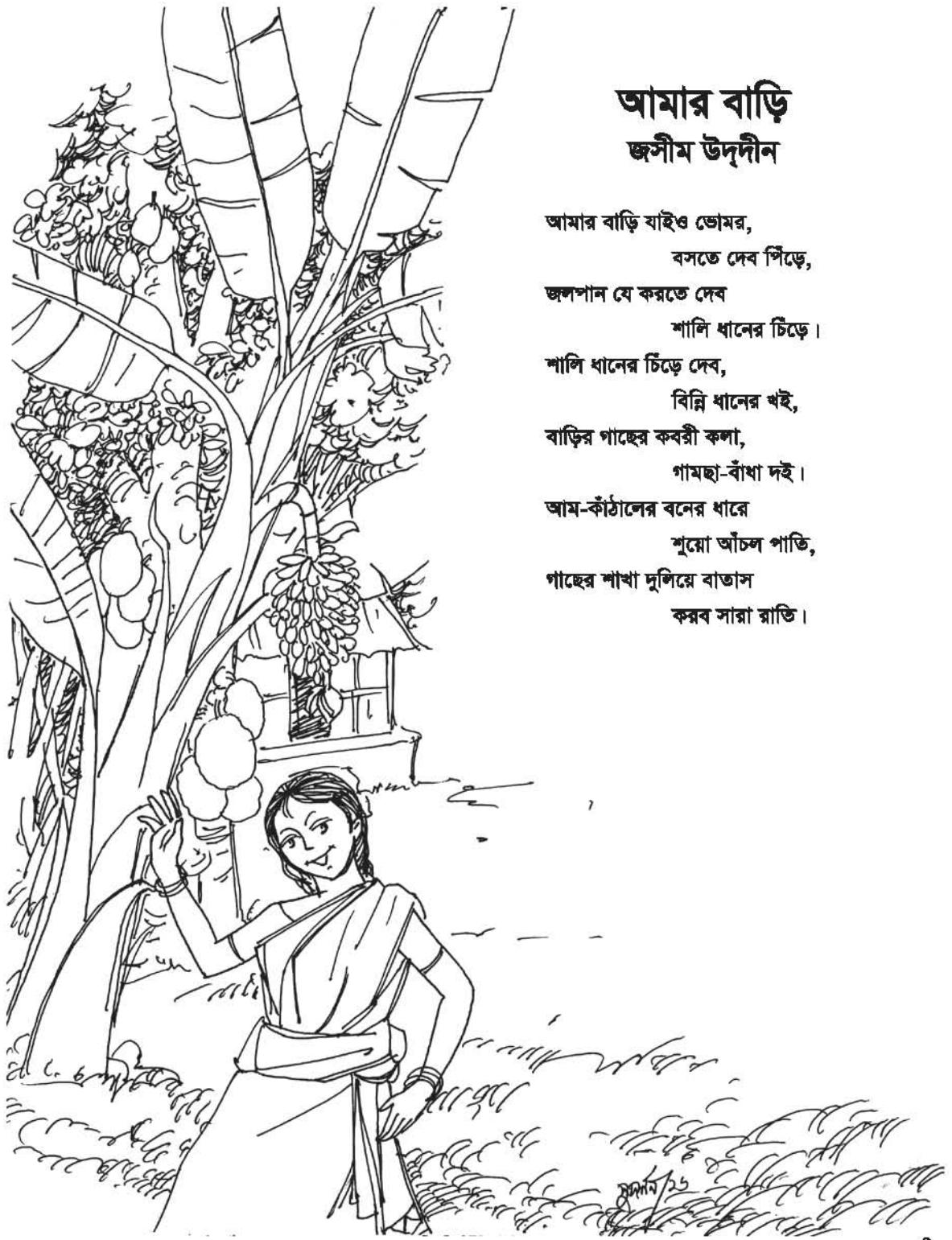
সূজনশীল প্ৰশ্ন

১। চেয়াৱম্যান আজমল সাহেবেৰ এলাকায় একজন ভালো মানুষ হিসেবে যথেষ্ট সুনাম রয়েছে, কিষ্টি তাৱ ছেলে কাৰণে-অকাৰণে বাড়িৰ কাজেৰ লোক, আশপাশেৰ খেটে খাওয়া মানুষেৰ সাথে খাৱাপ আচৰণ কৱে, তুচ্ছ তাছিল্য কৱে। চেয়াৱম্যান ছেলেকে ডেকে বুঝিয়ে বলেন, তুমি যাদেৱ আজ তুচ্ছ জ্ঞান কৱছ — সত্যিকাৱ অৰ্থে তাৱাই আধুনিক সভ্যতাৰ নিৰ্মাতা, তাৰে কাৰণেই আমৱা সুন্দৱ জীৱন যাপন কৱছি।

- | | |
|----|--|
| ক. | ‘কুলি-মজুৱ’ কবিতায় রেলপথে কোনটি চলে? |
| খ. | ‘শুধিতে হইবে খণ’— কথাটিৰ দ্বাৰা কী বোৰানো হয়েছে? |
| গ. | চেয়াৱম্যান সাহেবেৰ ছেলেৰ আচৰণে ‘কুলি-মজুৱ’ কবিতার কোন দিকটি প্ৰকাশ পেয়েছে — ব্যাখ্যা কৱ। |
| ঘ. | ‘চেয়াৱম্যান সাহেবেৰ মনোভাৱ ‘কুলি-মজুৱ’ কবিতার মূলভাবেই প্রতিফলন’ — বিশ্঳েষণ কৱ।’ |

আমার বাড়ি জসীম উদ্দীন

আমার বাড়ি যাইও ভোমর,
বসতে দেব পিঁড়ে,
জলপান যে করতে দেব
শালি ধানের চিঁড়ে।
শালি ধানের চিঁড়ে দেব,
বিনি ধানের খই,
বাড়ির গাছের কবরী কলা,
গাযছা-বাঁধা দই।
আম-কাঁঠালের বনের ধারে
শুয়ো আঁচল পাতি,
গাছের শাখা দুলিয়ে বাতাস
করব সারা রাতি।



চাঁদযুধে তোর চাঁদের চুমো
 যাখিয়ে দেব সুরে,
 তারা ফুলের মালা গাঁথি,
 জাড়িয়ে দেব বুকে ।
 গাই দোহনের শব্দ শুনি
 জেগো সকাল বেলা,
 সারাটা দিন তোমায় লয়ে
 করব আমি খেলা ।
 আমার বাড়ি ডালিম গাছে
 ডালিম ফুলের হাসি,
 কাঞ্জলা দিঘির কাঞ্জল জলে
 হাঁসগুলি বায় ভাসি ।
 আমার বাড়ি যাইও ভোমর,
 এই বরাবর পথ,
 মৌরি ফুলের গন্ধ ঝঁকে
 ধামিও তব রথ ।



শব্দার্থ ও টীকা

- ভোমর — মৌমাছি। অমরের কথ্য ক্রপ ভোমর। কবিতাটিতে কেনো বছু বা প্রিয়জনকে ভোমর বলে সংবোধন করে নিজের বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
- শালি ধান — এক প্রকার আমন ধান, যা হেমন্তকালে উৎপন্ন হয়।

- বিন্নি ধান — বাংলাদেশের আদি জাতের ধানগুলোর একটি।

কবরী কলা — স্বাদের জন্য বিখ্যাত এক প্রকার কলা।

‘গামছা-বাঁধা দই’ — অধিক ঘনফুর ফলে যে দই গামছায় রাখলেও রস গড়িয়ে পড়ে না।

‘শুয়ো আঁচল পাতি’ — আঁচল পেতে শুয়ে থেকো।

‘গাই দোহনের শব্দ’ — গাড়ীর দুধ দোহনের শব্দ।

কাজলা দিঘি — কাজলের মতো কালো জলের দিঘি।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের সৌজন্য, শিষ্টাচার ও মানবপ্রেমে উদ্বৃক্ত করা।

পাঠ-পরিচয়

কবিতাটি কবি জসীম উদ্দীনের ‘হাসু’ কাব্যস্থলের অঙ্গর্গত। এখানে কোনো বস্তু বা প্রিয়জনকে নিজের গ্রামের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছেন কবি। তিনি তাকে আপ্যায়ন করতে চান শালি ধানের চিঠা, বিন্নি ধানের খই, কবরী কলা একং গামছা বাঁধা দই দিয়ে। প্রকৃতির সান্নিধ্যে কেমন করে অতিথির প্রাণ জুড়াবে তারও এক নিবিড় পরিচয় আছে কবিতাটিতে। যুগ যুগ ধরেই অতিথি আপ্যায়নে বাঙালির সুনাম রয়েছে। অতিথির বিশাম ও আনন্দের জন্য গৃহস্থের আন্তরিক প্রয়াস এ কবিতায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অতিথি যে গৃহে এসেছেন সেই গৃহের গাছ, ফুল, পাখিও যেন অতিথিকে আপ্যায়নে উন্মুখ হয়ে আছে। অতিথিকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সৌজন্য, শিষ্টাচার ও মানবপ্রেমের অসাধারণ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এ কবিতায়।

କବି-ପରିଚିତି

କବି ଜ୍ୟୋମି ଉଦ୍‌ଦୀନ ୧୯୦୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦେ ଫରିଦପୁର ଜେଲାର ତାଷୁଳଖାନା ଗ୍ରାମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେନ । ତା'ର କବିତାଯ ଆମରା ପଞ୍ଚିର ମାନୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସହଜ-ସୁନ୍ଦର ରୂପଟି ଦେଖିତେ ପାଇ । ପଞ୍ଚିର ମାଟି ଓ ମାନୁଷେର ସଙ୍ଗେ ତା'ର କବିହଦୟ ଯେଣ ଏକ ହୟେ ମିଶେ ଆଛେ । ତା'ର ଉତ୍ସେଖ୍ୟୋଗ୍ୟ କାହିନିକାବ୍ୟ : ‘ନକ୍ଷୀ କାଂଥାର ମାଠ’, ‘ସୋଜନ ବାଦିଆର ଘାଟ’; କାବ୍ୟଅତ୍ମ : ‘ରାଖାଲୀ’, ‘ବାଲୁଚର’, ‘ମାଟିର କାନ୍ଦା’; ନାଟକ : ‘ବେଦେର ମେଯେ’ । ତା'ର ଶିଶୁତୋଷ ଗଢ଼େର ମଧ୍ୟେ ରଯେଛେ ‘ହାସୁ’, ‘ଏକ ପଯସାର ବାଣୀ’, ‘ଡାଲିମକୁମାର’ । ୧୯୭୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦେ ତିନି ଢାକାଯ ଯୁଦ୍ଧବରଣ କରେନ ।

କର୍ମ-ଅନୁଶୀଳନ

- ক. তোমার বাড়িতে অতিথি এলে কীভাবে তাঁর যত্ন নেওয়া হয়, বর্ণনা কর (একক কাজ)।
 খ. বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী খাবারসমূহের (অঞ্চলভিত্তিক) তালিকা তৈরি কর (দলীয় কাজ)।

ନୟନା ପ୍ରଶ୍ନ

ବନ୍ଦନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଶ୍ନ

କବିତାଙ୍କଟି ପଡେ ୩ ଓ ୪ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦାଓ :

ଆଯ୍ ଛେଲେରା ଆଯ୍ ମେଯେରା

ଫଳ ତୁଳିତେ ଯାଇ —

ফুলের মালা গলায় দিয়ে

মামার বাড়ি যাই

ବାଡେର ଦିନେ ମାମାର ଦେଶେ

ଆম কড়োতে সুখ

পাকা জামের শাখায় উঠি

ରୁଣିନ କରି ମୁଖ ।

৩. উন্নতির প্রথম স্তরকের সাথে নিচের কোন চরণ/ চরণসমূহে মিল লক্ষ করা যায়-

 - আমার বাড়ি যাইও ভোমর / বসতে দেব পিঁড়ে।
 - গাছের পাতা দুলিয়ে বাতাস / করব সারা রাতি।
 - তারা ফলের মালা গাঁথি / জড়িয়ে দেব বকে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

৪. উন্নতির দিতীয় স্তরকের সাথে 'আমার বাড়ি' কবিতার মিল কোথায় ?
 ক. প্রকৃতিতে খ. নিম্নলিখিতে
 গ. খাদ্য-বর্ণনায় ঘ. বঙ্গভূমি

সুজনশীল প্রক্ষে

১. তুমি যাবে ভাই — যাবে মোর সাথে, আমাদের ছোট গাঁয়,
গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের বায়,
মায়া মমতায় জড়াজড়ি করি
মোর শেহখানি রহিয়াছে ভরি
মায়ের বুকেতে, বোনের আদরে, ভায়ের স্নেহের ছায়।

ক. ‘আমার বাড়ি’ কবিতায় কাজলা দীঘির কাজল জলে কী হাসে?
খ. ‘আমার বাড়ি’ কবিতায় কবি বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কেন?
গ. উদ্বীপকের প্রথম চরণের সাথে ‘আমার বাড়ি’ কবিতার কোন অংশের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্বীপক ও ‘আমার বাড়ি’ কবিতার ভাবার্থ কি এক? বিশ্লেষণ কর।



শোন একটি মুজিবরের থেকে গৌরীপ্রসন্ন মঙ্গমদার

শোন একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কর্তৃত্বরের খনি-প্রতিখনি
আকাশে বাতাসে উঠে রাপি
বাংলাদেশ, আবার বাংলাদেশ ।।

সেই সবুজের বুক চেরা যেঠোপথে
আবার যে ঘাব ফিরে, আবার
হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাব
শিল্পে – কাব্যে কোথায় আছে
হায়রে এমন সোনার খনি ।।

বিশ্বকবির ‘সোনার বাংলা’
নজরঞ্জনের ‘বাংলাদেশ’
জীবনানন্দের ‘কল্পসী বাংলা’
জলপের বে তার নেই কো শেষ, বাংলাদেশ ।

‘জয় বাংলা’ বলতে মনরে আবার
এখনো কেন ভাব, আবার
হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাব
অঙ্ককারে পুব আকাশে
উঠবে আবার দিনমণি ।।

শব্দার্থ ও টীকা

- ‘একটি মুজিব’ — ‘একজন মুজিব’। জাতির পিতা বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতির আশা-ভরসার একক আধিকার্যস্থল।
- ‘লক্ষ মুজিবরের
কর্তৃত্বের খনি’ — একান্তরে বঙবন্ধুর বঙ্ককর্তে স্বাধীনতা আহ্বানের মধ্য দিয়ে যেন লক্ষ বাঙালির যিলিত কর্তৃত্ব স্বাধীনতার জন্য গর্জে উঠেছিল।
- ‘হারানো বাংলাকে
আবার তো ফিরে
পাব’ — একসময় এই বাংলা ছিল স্বাধীন জনপদ। ১৯৫৭ সালে তা ব্রিটিশদের কাছে স্বাধীনতাহারায়। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগে এই দেশ – পাকিস্তানের অঙ্গরূপ হলো বিভক্ত পূর্ববাংলা পরিচিতি পায় পূর্ব পাকিস্তান নামে। পাকিস্তানের ২৩ বছরের চাপিয়ে দেওয়া দুষ্টশাসনে বাঙালি একে একে হারাতে বসে সব অধিকার। মহান মুক্তিযুক্তে কাঞ্জিত

বিজয়ের মাধ্যমে সেই হারানো স্বাধীন পূর্ব বাংলাকে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্বকবির

- ‘সোনার বাংলা’ — বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচিত একটি দেশোত্তোধক গানে এই দেশকে ‘সোনার বাংলা’ বলে অভিহিত করেছেন – যার প্রথম দশ চরণ আমাদের জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃত।
- নজরুলের
‘বাংলাদেশ’ — ‘বাংলাদেশ’ শিরোনামের প্রথম কবিতাটি আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা। তাঁর কবিতা, সংগীত ও প্রবন্ধে বাংলা ও বাঙালির মুক্তির কথা উচ্চারিত হয়েছে বারবার। মহান মুক্তিযুদ্ধে নজরুলের উদ্দীপনামূলক লেখাগুলো ছিল আমাদের অন্তর্হীন প্রেরণার উৎস।

জীবনানন্দের

- ‘রূপসী বাংলা’ — নিসর্গের কবি জীবনানন্দ দাশ বাংলার প্রকৃতির অনিন্দ্য রূপ সৌন্দর্য চিরায়ত মহিমায় উপস্থাপন করেছেন তাঁর ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যগ্রন্থে।

‘জয় বাংলা

- বলতে.....ভাব’ — পাকিস্তান বিরোধী সকল সংগ্রাম-আন্দোলনে ‘জয় বাংলা’ প্রোগানেই প্রকল্পিত হতো সারা দেশ। জয় সুনিশ্চিত ও অবশ্যত্বাবী জেনে দ্বিহাইন চিন্তে এই একটি প্রোগানেই সংযুক্ত হয়েছিল সমগ্র বাঙালি জাতি।

পার্টের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বৃদ্ধ করা।

পার্ট-পরিচিতি

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই গানটি অন্যান্য গানের সাথে বারবার বাজানো হতো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। গানটির সুরকার ও শিল্পী ছিলেন বিখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী অংশুমান রায়। অসামান্য জনপ্রিয় হওয়ার পর গৌরীপ্রসন্ন নিজেই এই গানটিকে ‘The voice of not one, but million mujibors singing’ শিরোনামে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন, যা গেয়েছিলেন শিল্পী কবরী নাথ।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাতে এই দেশে হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নির্বিচারে বাঙালি জনগণের উপর হত্যায়জের সূচনা করলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এরপরই তাঁকে প্রেরিত করে পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। এর আগে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বলেছিলেন ‘এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম’। তাঁর বজ্রকঠের আহ্বান ঐ মুহূর্তেই সমগ্র বাংলার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাস কারাগারে বন্দি থাকলেও তাঁর স্বাধীনতার ডাক কোটি বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা হয়ে বেজেছে চারদিকে। পাকিস্তান-বিরোধী সকল সংগ্রাম-আন্দোলনে সারা দেশেই প্রচার করা হতো তাঁর ভাষণ-বক্তৃতা। মুক্তিযোদ্ধাসহ স্বাধীনতাকামী সকল মানুষের রক্তে-চেতনায় তা প্রশংসনো জাগাতো।

কবি-পরিচিতি

আধুনিক বাংলা গানের স্বর্ণযুগের কিংবদন্তি গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (জন্ম: ১৯২৪ – মৃত্যু: ১৯৮৬) এর আদি পৈতৃক নিবাস পাবনা জেলায়। ‘কফি হাউসের সেই আড়াটা’, ‘ও নদীরে’, ‘নিশিরাত বাঁকা চাঁদ’, ‘ঘঙ্গল দীপ ঝঁঁলে’, ‘যদি হিমালয়- আঞ্চলিক’, ‘ও পলাশ ও শিমুল’, ‘আকাশ কেন ডাকে’ সহ তাঁর লেখা অসংখ্য গান আমাদের সংগীত জগতের চিরায়ত সম্পদ বলে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। তাঁর রচিত বেশ কয়েকটি গান যেমন ‘শোন একটি মুজিবরের থেকে’, ‘আমরা সবাই বাঙালি’, ‘মাণো তাবনা কেন’, ‘পথের ক্লান্তি ভুলে’ – ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় এ দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষকে অন্তিম প্রেরণা যুগিয়েছিল।

১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণে তিনি রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে বাংলাদেশে এসেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়াত গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে ‘মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা’ জানানো হয় ২০১২ সালে।

কর্ম-অনুশীলন

ক. বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম অবলম্বনে দেয়ালপত্রিকা প্রকাশ কর [দলীয় কাজ]।

খ. শিল্পী, গীতিকার ও সুরকারের নাম উল্লেখসহ ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে প্রচারিত উদ্দীপনামূলক গানগুলোর একটি তালিকা তৈরি কর।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘সেই সবুজের বুক চেরা’ পথটি কেমন?

- | | |
|---------|------------|
| ক. পাকা | খ. মেঠো |
| গ. ভাঙা | ঘ. গ্রাম্য |

২. কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বাংলাকে ‘সোনার খনি’ বলা হয়েছে?

- | | |
|------------------|----------------|
| ক. লড়াই-সংগ্রাম | খ. শিল্প-কার্য |
| গ. সংগীত | ঘ. ক্রীড়াশৈলী |

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জীবনদানের প্রতিজ্ঞা লয়ে লক্ষ সেনা পাছে

তোমার হৃকুম তামিলের লাগি সাথে তব চলিয়াছে।

৩. কবিতাংশের ‘তোমার হৃকুম’ ‘শোন একটি মুজিবরের থেকে’ কবিতার কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?

- | |
|--------------------------------|
| ক. গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার |
| খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান |
| গ. কাজী নজরুল ইসলাম |
| ঘ. জীবনানন্দ দাশ |

৮. উপর্যুক্ত সাদৃশ্যের কারণ, তিনি-
- বাঙালির জাতির পিতা
 - স্বাধীনতার স্বপ্ন-দিশারী
 - বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | | | |
|----|---------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | ii ও iii |
| গ. | i ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. মুজিবুর রহমান

ওই নামে যেন বিসুভিয়াসের অগ্নি-উগারী বাণ।

বঙ্গদেশের এ প্রাত হতে সকল প্রান্ত ছেয়ে

জ্বালায় জ্বলিছে মহাকালানন্দ বাঞ্ছা অশনি বেয়ে।

মায়ের বুকের ভায়ের বুকের বোনের বুকের জ্বালা,

তব সম্মুখে পথে পথে আজ দেখায়ে চলিছে আলা।

ক. কোন কবির ঢোকে বাংলাদেশ ‘রূপসী বাংলা’?

খ. ‘অঙ্ককারে পুব আকাশে উঠবে আবার দিনমণি’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের ২য় চরণে ‘শোন একটি মুজিবরের থেকে’ কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি ‘শোন একটি মুজিবরের থেকে’ কবিতার সম্পূর্ণভাব বহন করে কি? স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

সবার আমি ছাত্র সুনির্মল বসু

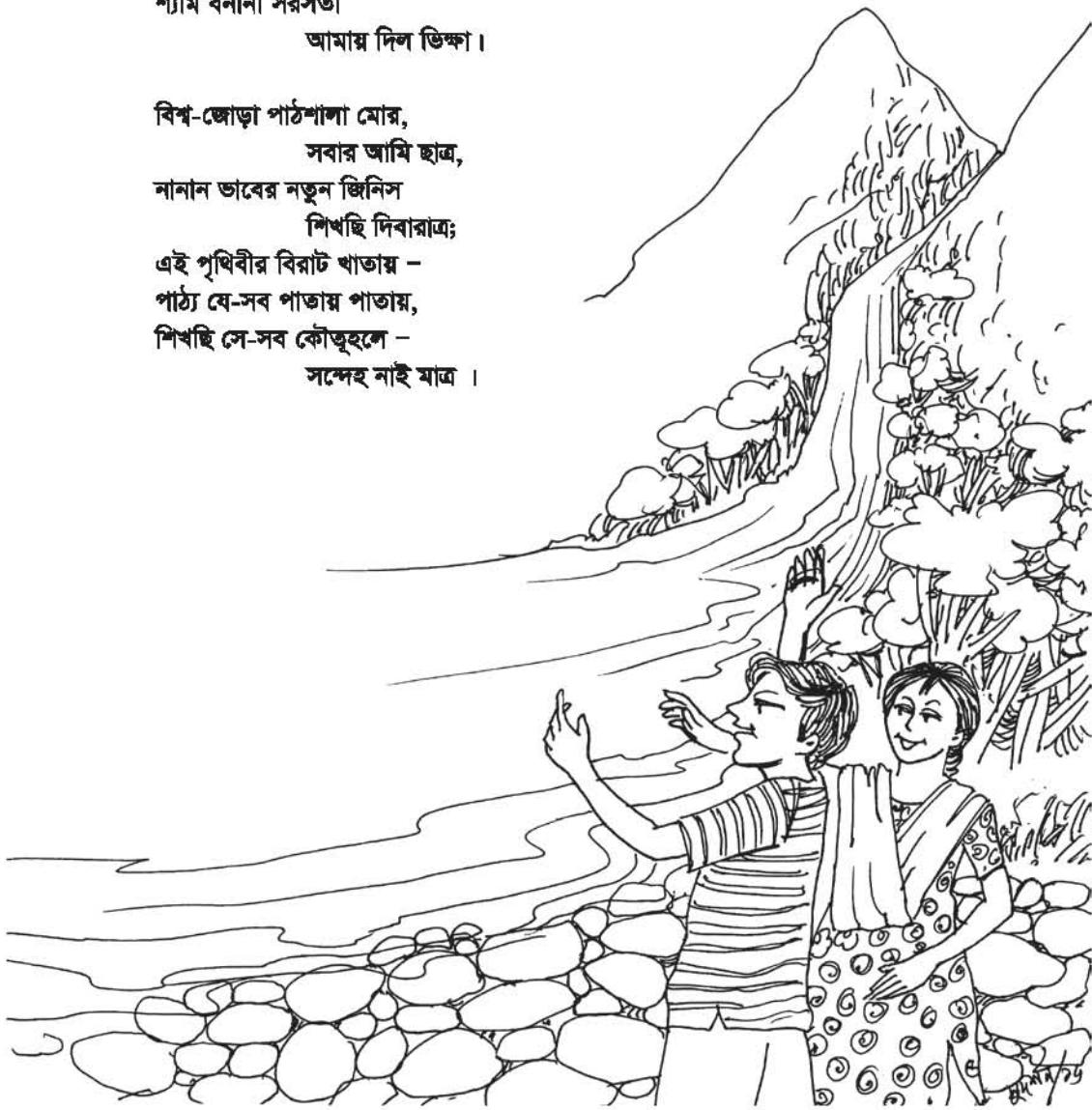
আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাই রে,
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাই রে।
পাহাড় শিখার তাহার সমান
হই যেন ভাই মৌন-মহান,
খোলা মাঠের উপদেশে –
দিল-খোলা হই ভাই রে।

সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয়
আগন তেজে জ্বলতে,
চাঁদ শিখালো হাসতে ঘিটে,
ঘনুর কথা বলতে।
ইঙিতে তার শিখায় সাগর –
অন্তর হোক রত্ন-আকর;
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম
আগন বেগে চলতে।



মাটির কাছে সহিষ্ঠতা
 পেলাম আমি শিক্ষা,
 আপন কাজে কঠোর হতে
 পারাগ দিল দীক্ষা।
 বারুনা ভাহার সহজ গানে
 গান জাগালো আমার ধাপে,
 শ্যাম বনানী সরসতা
 আমায় দিল ভিক্ষা।

বিশ্ব-জোড়া পাঠশালা মোর,
 সবার আমি ছাত,
 মানান ভাবের নতুন জিনিস
 শিখছি দিবারাত;
 এই পৃথিবীর বিরাট খাতায় -
 পাঠ্য যে-সব পাতায় পাতায়,
 শিখছি সে-সব কৌতুহলে -
 সন্দেহ নাই যাত।



শব্দার্থ ও টীকা

দিল-খোলা	— মনখোলা, মুক্তমন।
মন্ত্রণা	— উপদেশ, যুক্তি-পরামর্শ, প্রেরণা।
সহিষ্ণুতা	— সহ্য করার ক্ষমতা।
পাষাণ	— পাথর।
শ্যাম বনানী	— সবুজ বন।
মৌন-মহান	— দৈর্ঘ্য-স্থৈর্যে পাহাড়ের মতো মৌন বা নীরব এবং গুণে-কর্মে পাহাড়ের মতো সুউচ্চ বা মহান হ্বার কথা বলা হয়েছে।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীকে সততা ও নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বৃদ্ধ করা।

পাঠ-পরিচিতি

জন্মগতভাবেই বেঁচে থাকার জন্য মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। মানবিক ও নৈতিক শিক্ষালাভেও প্রকৃতি সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি। আকাশের অসীমতা আমাদের উদারতা শেখায়। আমাদের কর্মপ্রেরণার বড় উৎস নিরঙ্গর বায়ু-প্রবাহ। পাহাড়ের উচ্চতা আমাদের উদারতা শিখতে উৎসাহ জেগায়। আআত্যাগের আরেকটি বড় উদাহরণ সূর্য। সে তার নিজের আলো দিয়ে সবাইকে আলোকিত করে। সাগর তার বুকে যুগ যুগ ধরে বিশাল রত্নভাঙার সংরক্ষণ করে নীরবে মানবকল্যাণ করে যায়। নদী আমাদের গতিশীল থাকার শিক্ষা দেয়। গতিময় ঝরনা মনকে ভিতর থেকে চলমান রাখতে সাহায্য করে। সবুজ বন আমাদের মনকে রাখে সজীব। মাটি নিজে যেমন সব কিছু সহ্য করতে পারে, তেমনি অন্যদেরও সে সহিষ্ণুতা শিখায়। নিজের সব কাজে দৃঢ় থাকাটা, পাথরের কাছ থেকে আমরা শিখতে পারি। এভাবে পৃথিবীর সকল বস্তু বা ব্যক্তির কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েই আমাদের পথ চলতে হবে।

কবি পরিচিতি

সুনির্মল বসু ১৯০২ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিহারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বৃহত্তর ঢাকার বিক্রমপুরে। তিনি ছিলেন কবি ও শিশুসাহিত্যিক। কবিতা, গল্প কাহিনি, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনি ইত্যাদি বিষয়ে শিশু ও কিশোর উপযোগী সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : ‘ছানাবড়া’, ‘বেড়ে মজা’, ‘হেচে’, ‘হলস্তুল’, ‘কথা শেখা’, ‘পাততাড়ি’ ইত্যাদি। ১৯৫৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. নৈতিকতা বিষয়ে আলোচনাচক্র ও বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন কর [দলগত কাজ]।
- খ. মানুষের জন্য কল্যাণকর গুণসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
- গ. তোমার পরিচিত একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি সম্পর্কে লেখ।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবিতায় আপন কাজে কঠোর হওয়ার শিক্ষা দেয় কোনিটি ?
 - ক. পাহাড়
 - খ. পাষাণ
 - গ. ঝরনা
 - ঘ. মাটি

২. ‘এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?

- ক. পৃথিবীতে অজানা বলে কিছু নেই
- খ. পৃথিবীকে বিরাট খাতা বলা হয়েছে
- গ. পৃথিবীর সবকিছুই জানের আধার
- ঘ. প্রকৃতি বড় একটি খাতা বিশেষ

৩. যখন মানবকুল ধনবান হয়

তখন তাদের শির সমুল্লত রয়
কিন্তু ফলশালী হলে এই তরুণ
অহংকারে উচ্চ শির না করে কখন

- উদ্দীপকের সাথে ‘সবার আমি ছাত্র’ কবিতার সঙ্গতিপূর্ণ চরণ -

- i. শ্যাম বনানী সরসতা
আমায় দিল ভিক্ষা
- ii. মাটির কাছে সহিষ্ণুতা
পেলাম আমি শিক্ষা
- iii. আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাইরে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪. উদ্দীপকে ‘সবার আমি ছাত্র’ কবিতার কোন শিক্ষণীয় দিকটি - ফুটে উঠেছে ?

- ক. নত না হওয়া
- খ. শিক্ষা অর্জন করা
- গ. মিলে মিশে থাকা
- ঘ. উদ্বিগ্ন না হওয়া

সৃজনশীল প্রশ্ন

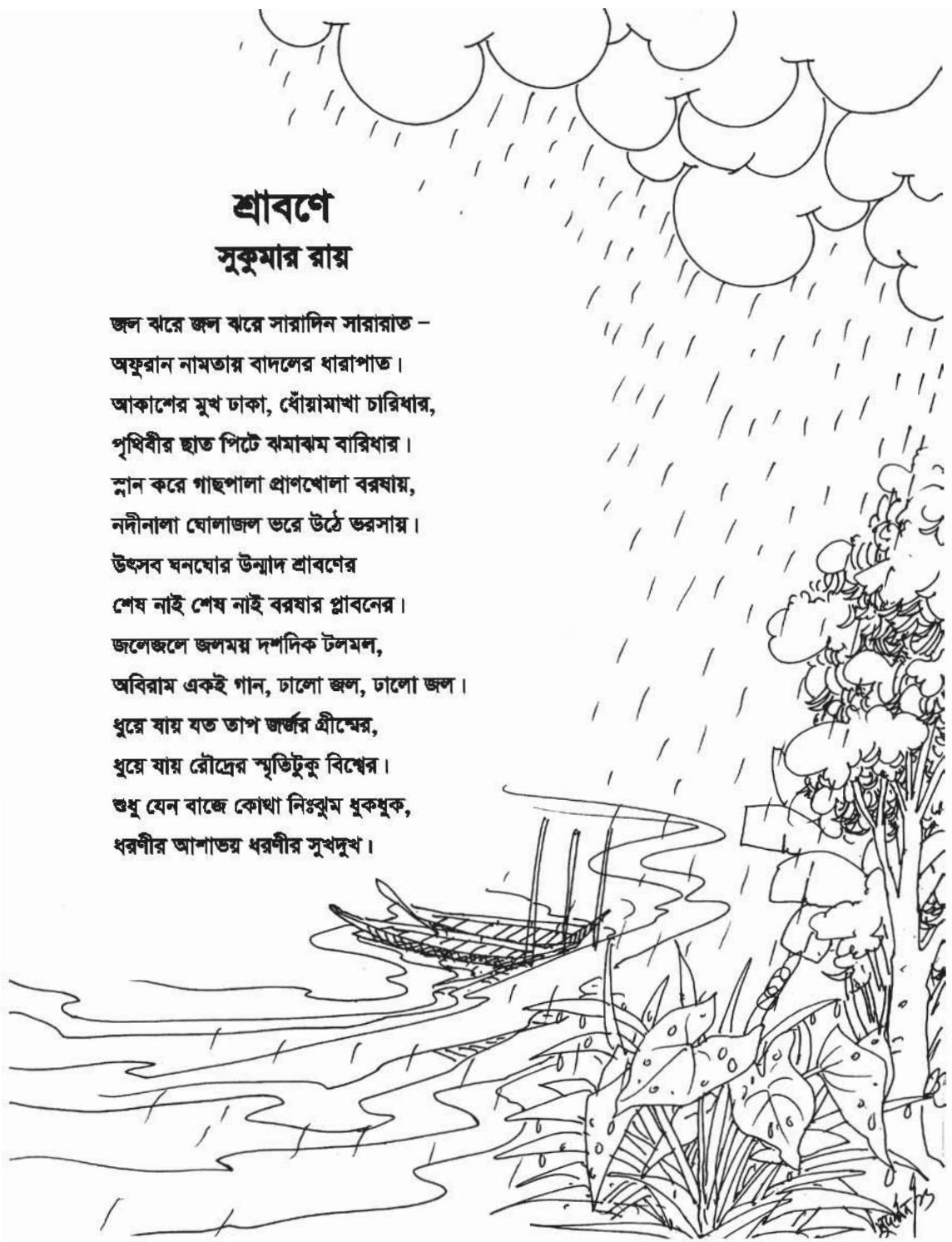
১. উদ্দীপক ১ম অংশ : মক্কার পথে প্রান্তরে গৌত্তলিকের প্রস্তরঘায়ে মহানবি আহত হইয়াছেন, ব্যঙ্গ বিদ্রূপে বারবার উপহাসিত হইয়াছেন; কিন্তু তাহার অন্তর ভেদিয়া একটি মাত্র প্রার্থনার বাণী জাগিয়াছে; – ‘এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা কর’।

২. উদ্দীপক ২য় অংশ : মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) সবার আদর্শ ও অনুকরণীয়ও বটে। সদা হাস্যোজ্জ্বল ও মিষ্টভাবী মহানবি সবার কাছে ‘মাটির মানুষ’। তাঁর সান্নিধ্যে সবাই যেমন কাজে গতি পেত, তেমনি সবাই তাঁর কাছ থেকে শিখেছিল সুন্দর সুন্দর চিন্তা করতে। আর প্রয়োজনে কঠিন হতেও তিনি পিছপা হতেন না।

- ক. কোনটি আমাদেরকে ‘দিল খোলা’ হওয়ার শিক্ষা দেয়?
- খ. ‘সবার আমি ছাত্র’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
- গ. উদ্দীপকের ১ম অংশে ‘সবার আমি ছাত্র’ কবিতার কোন অংশের পরিচয় রয়েছে – ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনাদর্শ যেন মানুষের জন্য ‘বিশ্বজোড়া পাঠশালা’র মতোই – উদ্দীপক ও কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

ଆବଶେ সুକୁମାର ରାୟ

জଳ ସାରେ ଜଳ ସାରେ ସାରାଦିନ ସାରାରାତ -
ଅଫୁରାନ ନାମତାର ବାଦଲେର ଧାରାପାତ ।
ଆକାଶେର ମୁଖ ଢାକା, ଧୋଗାମାର୍ଥ ଚାରିଧାର,
ପୃଥିବୀର ଛାତ ପିଟେ ବନ୍ଦାରମ ବାରିଧାର ।
ମୂଳ କରେ ଗାହପାଳା ପ୍ରାଣଧୋଳା ବରଷାମ,
ନଦୀନାଳା ଘୋଲାଜଳ ଭରେ ଉଠେ ଭରସାମ ।
ଉତ୍ସବ ଘନଥୋର ଉନ୍ନାଦ ଆବଶେର
ଶେଷ ନାଇ ଶେଷ ନାଇ ବରଷାର ପ୍ଲାବନେର ।
ଜଳେଜଳେ ଜଳମଯ ଦଶଦିନିକ ଟେଲମଳ,
ଅବିରାମ ଏକଇ ଗାନ, ଢାଳୋ ଜଳ, ଢାଳୋ ଜଳ ।
ଧୂରେ ଯାଇ ଯତ ତାପ ଜର୍ଜର ଶ୍ରୀମେର,
ଧୂଯେ ଯାଇ ରୌଦ୍ରର ଶୃଭିଟୁକୁ ବିଷେର ।
ଶୁଦ୍ଧ ଯେନ ବାଜେ କୋଥା ନିଃବୁଦ୍ଧ ଶୁକଥୁକ,
ଧରଣୀର ଆଶାତ୍ୟ ଧରଣୀର ସୁଖଥୁକ ।



শব্দার্থ ও টীকা

‘অফুরান নামতায়’

- বাদলের ধারাপাত’ — গণিতে ‘নামতা’ বলতে বোবায় শুণ করার ধারাবাহিক তালিকা; আর ‘ধারাপাত’ হলো অঙ্গ শেখার প্রাথমিক বই। এ কবিতায় বৃষ্টিধারার পতনকে বলা হচ্ছে ধারাপাত; বৃষ্টির পতনের অবিরাম রিমিকি ধ্বনি অনেকটা যেন শিশুদের নামতা পড়ার শব্দের মতো।
- ছাত — ছাদ। ছাদের কথ্য রূপ ছাত।
- বারিধার — জলের ধারা।
- উন্নাদ — উন্নাস্ত, ক্ষিণ। শ্রাবণ মাসে অবিরাম ধারা বর্ষণ ঘটে বলে কবি এখানে শ্রাবণকে ‘উন্নাদ শ্রাবণ’ বলেছেন।
- জর্জর — কাতর।
- নিঃবুম — নিঃবুম, নীরব, নিঃশব্দ।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ে আকৃষ্ট করে তোলা।

পাঠ-পরিচিতি

‘শ্রাবণে’ কবিতাটি সুকুমার রায়ের ‘খাই খাই’ ছড়াগ্রন্থের অঙ্গর্গত। গ্রীষ্মের দাবদাহে জর্জরিত প্রকৃতি অবিরাম বর্ষায় স্থান করে সজীব ও প্রাণবন্ত রূপ ধারণ করেছে, কবিতায় সে ছবিই আঁকা হয়েছে। বর্ষার জলে গাছপালা নদী-নলা থেকে শুরু করে রূক্ষ প্রকৃতি মুহূর্তেই জলে পরিপূর্ণ হয়। প্রকৃতিতে প্রাণের সংগ্রাম ঘটে। গ্রীষ্মকালের রোদের চিহ্ন ধূয়ে ধূয়ে প্রকৃতি এ সময় নতুন রূপ ধারণ করে। এভাবেই খুতুর পালাবদলের মতো মানব-মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের পালাবদল ঘটে।

কবি পরিচিতি

শিশু-কিশোর পাঠকদের কাছে সুকুমার রায় একটি প্রিয় নাম। তাঁর আদি পৈত্রিক নিবাস ময়মনসিংহ জেলায়। বাংলা সাহিত্যে তিনি অমর হয়ে আছেন প্রধানত রসের কবিতা, হাসির গল্প, নাটক ইত্যাদি শিশুতোষ রচনার জন্য। ‘আবোল তাবোল’, ‘হযবরল’, ‘পাগলা দাশু’ প্রভৃতি তাঁর অতুলনীয় রচনা। তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী একজন বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক। কিংবদন্তি চলচিত্র-নির্মাতা ও খ্যাতিমান সাহিত্যিক সত্যজিত রায় তাঁর পুত্র। সুকুমার রায়ের কলকাতায় জন্ম ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. শ্রাবণ মাসে তোমার এলাকায় কী কী পরিবর্তন ঘটে? লেখ।
খ. বর্ষার গান ও কবিতা নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন কর।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শ্রাবণের জল অবিরাম করে -

- ক. সংগীতের মতো খ. কোলাহলের মতো
গ. গণিতের মতো ঘ. নামতার মতো

২. ‘অবিরাম একই গান’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
- বর্ষার প্রাবন
 - নদীর ঘোলাজল
 - একটানা বৃষ্টি
 - সংগীত সঙ্গ্য
৩. বর্ষণমুখৰ দিনে অৱশ্যেৰ কেয়া শিহৰায়,
রৌদ্ৰ-দৰ্খ ধানক্ষেত আজ তাৰ স্পৰ্শ পেতে চায়,
– উদ্বীপকটি ‘শ্রাবণে’ কবিতাৰ যে দিকটিৰ সঙ্গে সাদৃশ্যপূৰ্ণ?
- অবিরাম বৃষ্টি
 - মেঘলা আকাশ
 - বৃষ্টিস্ন্যত প্ৰকৃতি
 - তাপ ধুয়ে যাওয়া
৪. ‘বৃষ্টি এল কাশবনে জাগল সাড়া ঘাসবনে’
– উদ্বীপকেৰ ভাৰধাৰা ‘শ্রাবণে’ কবিতাৰ কোন পঙ্কভিতে প্ৰতিফলিত হয়েছে?
- অফুৱান নাম্ভায় বাদলেৰ ধাৱাপাত
 - আকাশেৰ মুখ ঢাকা, ধোঁয়ামাখা চারিধাৰ
 - মান কৰে গাছপালা প্ৰাণখোলা বৰষাৰ
 - নদীনালা ঘোলাজল ভৱে উঠে ভৱসায়

সৃজনশীল প্ৰশ্ন

উদ্বীপক (১) আজিকাৱ রোদ ঘুমায়ে পড়িছে— ঘোলাটে মেঘেৰ আড়ে,
কেয়া বন পথে স্বপন বুনিছে— ছল ছল জলধাৰে।
কাহাৱ বিয়াৰী কদম্ব শাখে— নিৰ্বানু নিৱালায়,
ছোট ছোট রেণু খুলিয়া দিয়াছে— অস্ফুট কলিকায়।

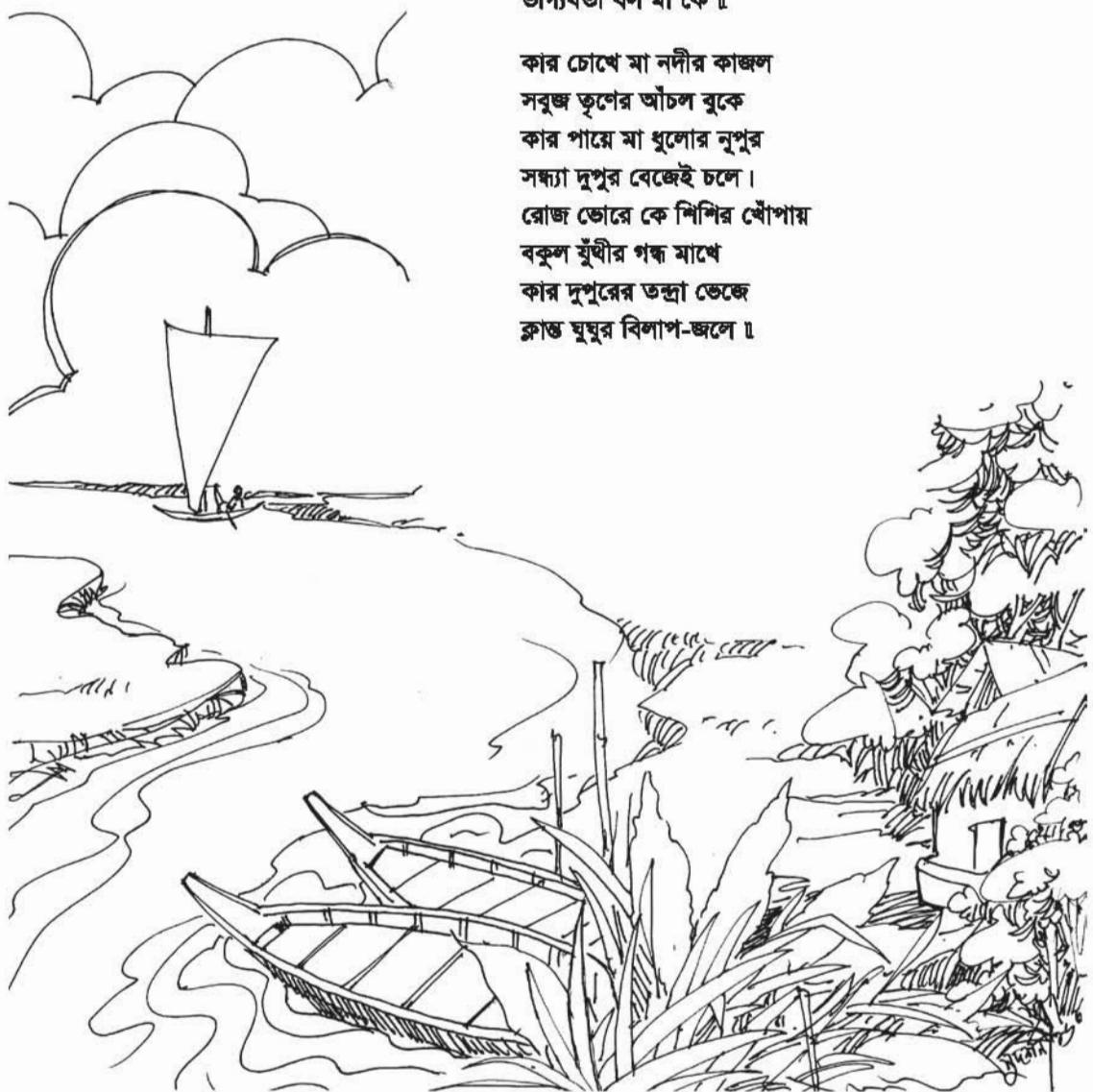
উদ্বীপক (২) কেউবা রঙিন কাথায় মেলিয়া বুকেৱ স্বপনখানি,
তাৰে ভাষা দেয় দীঘল সূতাৰ মায়াৰী আখৰ টানি।

- প্ৰাণখোলা বৰ্ষায় কে স্নান কৰে?
- ‘উন্নাদ শ্রাবণ’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
- ১ম উদ্বীপকে ‘শ্রাবণে’ কবিতায় বৰ্ণিত বৰ্ষাৰ কোন দিকটি চিত্ৰিত হয়েছে? বৰ্ণনা কৰ।
- ২য় উদ্বীপকটি ‘শ্রাবণে’ কবিতাৰ শেষ চৰণে প্ৰতিফলিত হয়েছে কি?— যুক্তিসহ বিচাৰ কৰ।

গরবিনী মা-জননী সিকান্দার আরু জাফর

ওরে আমার মা-জননী
জনাভূমি বাঙ্গলারে
তোর যত আর পুণ্যবতী
ভাগ্যবতী বল মা কে ॥

কার চোখে মা নদীর কাঞ্জল
সরুজ তৃণের আঁচল বুকে
কার পায়ে মা ধুলোর নৃপুর
সক্ষ্য দুপুর বেজেই চলে ।
রোজ ভোরে কে শিশির ঝৌপায়
বকুল ঝুঁঠীর গন্ধ মাথে
কার দুপুরের তল্লা ভেজে
ঝান্ট ঘূঘূর বিলাপ-জলে ॥

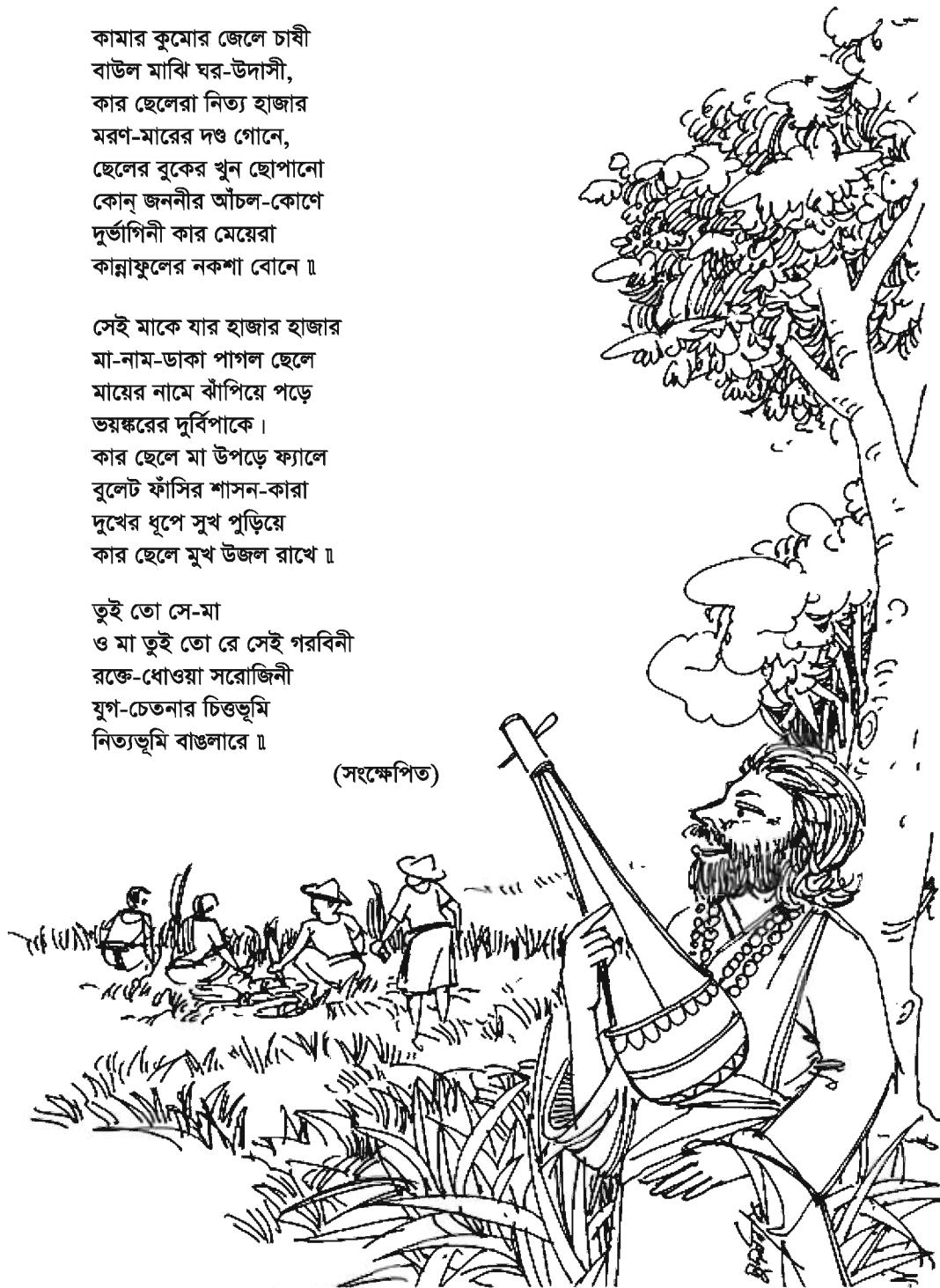


কামার কুমোর জেলে ঢাষী
 বাটুল মাঝি ঘর-উদাসী,
 কার ছেলেরা নিত্য হাজার
 মরণ-মারের দণ্ড গোলে,
 ছেলের বুকের খুন ছোপানো
 কোন্ জননীর আঁচল-কোগে
 দুর্ভাগিনী কার মেয়েরা
 কালাফুলের নকশা বোনে ॥

সেই মাকে যার হাজার হাজার
 মা-নাম-ডাকা পাগল ছেলে
 মায়ের নামে ঝাঁপিয়ে পড়ে
 ভয়ঙ্করের দুর্বিপাকে ।
 কার ছেলে মা উপড়ে ফ্যালে
 বুলেট ফঁসির শাসন-কারা
 দুখের ধূপে সুখ পুড়িয়ে
 কার ছেলে মুখ উজল রাখে ॥

তুই তো সে-মা
 ও মা তুই তো রে সেই গরবিনী
 রক্তে-ধোওয়া সরোজিনী
 যুগ-চেতনার চিঞ্চলী
 নিত্যভূমি বাঞ্ছারে ॥

(সংক্ষেপিত)



শব্দার্থ ও টীকা

পুণ্যবতী	— পুণ্য বা ভালো কাজ করেন এমন নারী।
সরোজিনী	— সরোজ মানে পদ্ম – সরোজের স্ত্রীবাচক রূপ সরোজিনী। এ কবিতায় দেশমাত্রিক বাংলাকে তুলনা করা হয়েছে কমনীয় পদ্মের সঙ্গে।
‘মরণ-মারের দণ্ড’	— মরণের আঘাত থেকে প্রাণ শান্তি।
ছোপানো	— ছোপ মানে ছাপ, রঙ। এখানে ছোপানো মানে রাঙানো।
পাগল ছেলে	— বাংলার মুক্তিকামী বিদ্রোহী ও তরুণ-যুবকেরাই ‘পাগল ছেলে’ – যারা নির্ভয়ে যুদ্ধে-সংগ্রামে লিঙ্গ হয়েছিল।
‘ভয়ক্ষরের দুর্বিপাকে’	— ভীতিকর দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা। এখানে ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধকে বোঝানো হয়েছে।
শাসন-কারা	— পাকিস্তানি দুঃশাসন – যা ছিল কারাগারের সমান।
উজল	— উজ্জ্বল শব্দটির কোমল রূপ।
‘যুগ-চেতনার চিন্তভূমি’ / নিত্যভূমি বাংলারে	— যুগের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করা চিরস্তন দেশমাত্রিক বাংলাদেশ।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীর মধ্যে স্বদেশ চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

পাঠ-পরিচিতি

কবিতাটি ‘বাংলা ছাড়ো’ কাব্যস্ত্রের অন্তর্গত। উপর্যুক্ত কবিতাটিতে পুণ্যবতী ভাগ্যবতী দেশমাতার গর্বিত হয়ে ওঠার কারণ অব্যবেষ্ট করা হয়েছে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে পরিবেশ-প্রকৃতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। শ্রমজীবী, কৃষিজীবী থেকে শুরু করে সব পেশাজীবী সন্তান এই মায়ের কোল জুড়ে থাকে। এই মাকে রক্ষা করার জন্য এই সন্তানরা শত কষ্ট সহ্য করে, তবে কোনো অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারকে তারা মেনে নিতে পারে না। মাকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনে তারা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতেও দিখা করে না। আবার এই মাকেও সন্তানের জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখতে হয়। সন্তানকে সাহস ও শক্তি যোগাতে হয়। দেশমাত্রিককে সকল দুঃশাসন থেকে রক্ষার জন্য মায়ের সন্তানরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা যে কোনো দুঃসময়ে জেল জুলুম ফাঁসির দণ্ড মাথায় নিয়ে নিজের সুখ শান্তি ও আলস্য পরিহার করে দেশের জন্য আত্মাগৎ করতে দিখা করে না। যুগের দাবি ও সময়ের দাবি রক্ষায় যে সন্তানরা সাহসের সাথে সংগ্রামের পথ বেছে নেয়, তাদের জন্য বাংলাদেশ সত্যিই গর্বিত। প্রকৃতপক্ষে বাংলার মাটি এই সাহসী ও সংগ্রামী জনতার ভিত্তিভূমি।

কবি-পরিচিতি

সিকান্দার আবু জাফর বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট কবি, নাট্যকার ও সাংবাদিক। জন্মেছেন সাতক্ষীরা জেলায়। জন্মসাল ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ। পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। ‘প্রসন্ন প্রহর’, ‘তিমিরান্তিক’, ‘বাংলা ছাড়ো’ প্রত্তি তাঁর কাব্যস্ত্র। ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ তাঁর বিখ্যাত নাটক। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৭৫ সালে।

কর্ম-অনুষ্ঠান

- ক. দেশপ্রেমমূলক কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন কর। (দলগত কাজ)
- খ. পূর্ববর্তী কোনো শ্রেণিতে পড়া তোমার ভালোলাগা কোনো স্বদেশপ্রেমের কবিতা সমক্ষে তোমার অনুভূতি লেখ।

নমুনা প্রশ্ন

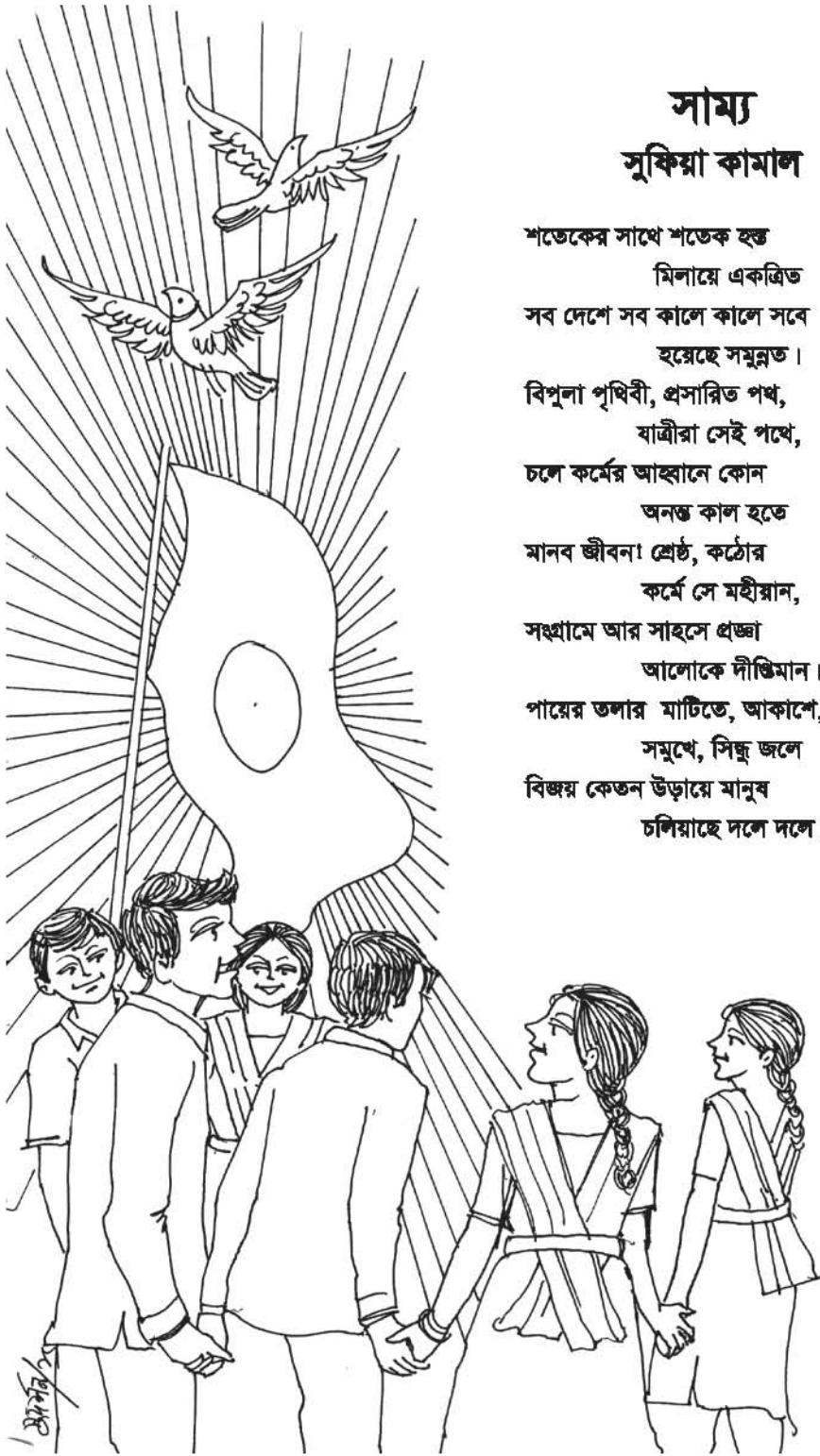
বঙ্গনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মায়ের আঁচল কোণে কী লেগে আছে?
- ক. বকুল ঝুঁঠীর গন্ধ
 - খ. কান্না ফুলের নকশা
 - গ. ছেলের বুকের খুন
 - ঘ. সবুজ তৃণ
২. ‘গরবিনী মা-জননী’ কবিতায় ‘দুর্ভাগিনী মেয়ে’ বলে কাদের বোঝানো হয়েছে?
- ক. বাংলার অবহেলিত মেয়েদের
 - খ. বাংলার স্বামীণ মেয়েদের
 - গ. দুর্ভাগ্য জর্জরিত মেয়েদের
 - ঘ. যুদ্ধে ক্ষতিহস্ত মেয়েদের
৩. আমরা অপমান সইব না
 ভীরুর মত ঘরের কোণে রইব না
 আমরা আকাশ থেকে বজ্জ হয়ে ঝরতে জানি
 তোমার ভয় নেই মা
 আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।
- উদ্ধীপকের চেতনা নিচের যে চরণে বিদ্যমান —
- ক. কার ছেলেরা নিত্য হাজার
 মরণ মারের দণ্ড গোণে
 - খ. ছেলের বুকের খুন ছোপানো
 কোন্ জননীর আঁচল কোণে
 - গ. মায়ের নামে ঝাপিয়ে পড়ে
 ভয়করের দুর্বিপাকে
 - ঘ. দুখের ধূপে সুখ পুড়িয়ে
 কার ছেলে মুখ উজল রাখে
- ৪। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে
 বাংলার স্বাধীনতা আনল যারা
 আমরা তোমাদের ভুলবনা।
- উদ্ধীপকে ‘গরবিনী মা জননী’ কবিতায় উল্লিখিত বাঙালি সন্তানের কোন দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে?
- ক. সংগ্রামের
 - খ. গর্বের
 - গ. প্রতিবাদের
 - ঘ. আত্মত্যাগের

সূজনশীল প্রশ্ন

মা দিবসে রত্নগর্ভা স্থীকৃত মায়েদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সাহেদা বেগমের বড় ছেলে সাজিদ অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন — আমাদের মা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মা। আমরা পিঠাপিঠি পাঁচ ভাই-বোন যখন খুব ছোট, তখনই বাবাকে হারালাম। মাকে কখনো ভেঙে পড়তে দেখিনি। দুঃখ-দারিদ্র্য-অভাব আমাদের নিত্য সঙ্গী ছিল। মা সব সময় আমাদেরকে খুশি রেখে, পড়াশোনা শিখিয়ে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তোমাকে শত সালাম ‘মা’। তোমার মুখের হাসির জন্য আমরা যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।

- ক. সম্ম্যাদুপুর মার পায়ে কী বাজে?
- খ. ‘রক্তে ধোওয়া সরোজিনী’ — বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
- গ. সাজিদের মাধ্যমে ‘গরবিনী মা-জননী’ কবিতার কোন বিশেষ দিকটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. “‘প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও ‘গরবিনী মা-জননী’ কবিতার বক্তব্য একই ধারায় প্রবাহিত” — বিশ্লেষণ কর।



সাম্য সুকিয়া কামাল

শতেকের সাথে শতেক হত
মিলায়ে একত্রিত
সব দেশে সব কালে কালে সবে
হয়েছে সমুন্নত ।
বিপুলা পৃথিবী, প্রসারিত পথ,
যাত্রীরা সেই পথে,
চলে কর্মের আহ্বানে কোন
অনন্ত কাল হতে
মানব জীবন। শ্রেষ্ঠ, কর্তৃর
কর্মে সে মহীরান,
সংগ্রামে আর সাহসে ধৃজা
আলোকে দীপ্তিমান ।
পায়ের তলার মাটিতে, আকাশে,
সমুখে, সিঙ্গু জলে
বিজয় কেতন উড়ায়ে মানুষ
চলিয়াছে দলে দলে ।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

শতেক	— একশত ।
সমুন্নত	— অতিশয় উঁচু ।
বিপুল	— বিশাল ।
প্রসারিত	— বিস্তার লাভ করেছে এমন ।
অনন্ত	— যার অন্ত বা শেষ নেই ।
মহীয়ান	— সুমহান ।
সংগ্রাম	— লড়াই ।
প্রজ্ঞা	— গভীর জ্ঞান ।
দীপ্তিমান	— উজ্জ্বল ।
সিঙ্গু	— সমুদ্র, সাগর ।
কেতন	— পতাকা ।

পাঠের উদ্দেশ্য

ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-শ্রেণি নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার বোধ সৃষ্টি করা ।

পাঠ-পরিচিতি

‘সাম্য’ কবিতাটি ‘নওল কিশোরের দরবারে’ গ্রন্থভুক্ত ‘মিলিত সেবা ও সাম্য প্রীতিতে’ কবিতার অংশবিশেষ । কোনো বড় কাজ কেউ একা করতে পারে না । সে জন্য দরকার হয় অনেক মানুষের মিলিত অংশগ্রহণ । সকলকে নিয়ে কাজ করার মাধ্যমে পৃথিবীর বহু দেশ উন্নত হয়েছে । পৃথিবীর অনেক মহৎ কাজের পেছনেই ছিল মানুষের সমিলিত প্রচেষ্টা । অসীম সাহস, সমিলিত সাধনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মানুষ এই পৃথিবীতে তার বিজয় ঘোষণা করেছে । এ জন্য ধর্ম, বর্ণ, গোত্র – শ্রেণি ভেদে সকল মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে ।

কবি-পরিচিতি

সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালে বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি ছিলেন একজন সফল সংগঠক ও নারীনেত্রী । তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সকল আন্দোলন-সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্বৃদ্ধ করেছেন । স্বাধীন বাংলাদেশে নারীজাগরণ বিশেষ করে নারীদের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি অংশী ভূমিকা পালন করেছেন । সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিপক্ষে তিনি সব সময় সোচার ছিলেন । তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ — ‘সাঁবোর মায়া’, ‘মায়া কাজল’, ‘কেয়ার কঁটা’ । তিনি ১৯৯৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন ।

কর্ম-অনুশীলন

- ক. অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন কর (দলীয় কাজ) ।
- খ. সম্প্রদায়গত সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে – তার পরিকল্পনা প্রস্তুত কর (একক কাজ) ।

ନୟନା ପ୍ରଶ୍ନ

ବହୁନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଶ୍ନ

উদ্বৃতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (১) একতাই বল
 - (২) চেষ্টায় সুসিদ্ধ করে জীবনের আশা

৩. উদ্ভুতির ১ম অংশের সাথে 'সাম্য' কবিতার কোন চরণসমূহের মিল আছে ?

 - বিপুলা পৃথিবী, প্রসারিত পথ / যাত্রীরা সেই পথে
 - শতকের সাথে শতক হস্ত / মিলায়ে একত্রিত
 - বিজয় কেতন উড়ায়ে মানুষ / চলিয়াছে দলে দলে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

৮. উদ্ধৃতাংশের সাথে ‘সাম্য’ কবিতার কোন ভাবের মিল আছে।

- | | | | |
|----|------------------|----|-----------|
| ক. | সংগ্রাম | খ. | প্রচেষ্টা |
| গ. | সম্মিলিত অবস্থান | ঘ. | সাহস |

সুজনশীল প্রশ্ন

১. অমিত সাহেবে একটি পাঠ্যগ্রন্থ স্থাপনের জন্য দৃঢ় প্রতিভা। কিন্তু তাঁর একার পক্ষে এত বিশাল কাজ সম্পাদন কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। তিনি কারও সহযোগিতা নিতে সম্মত নন। পরে গ্রামের সকল শ্রেণির মানুষের সার্বিক সহযোগিতায় পাঠ্যগ্রন্থ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। এখন সবাই পাঠ্যগ্রন্থ থেকে বই সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় ভাবে আহরণ করতে পারছে।

ক. ‘সাম্য’ কবিতায় কোনটির মাধ্যমে জীবন মহীয়ান হয়?

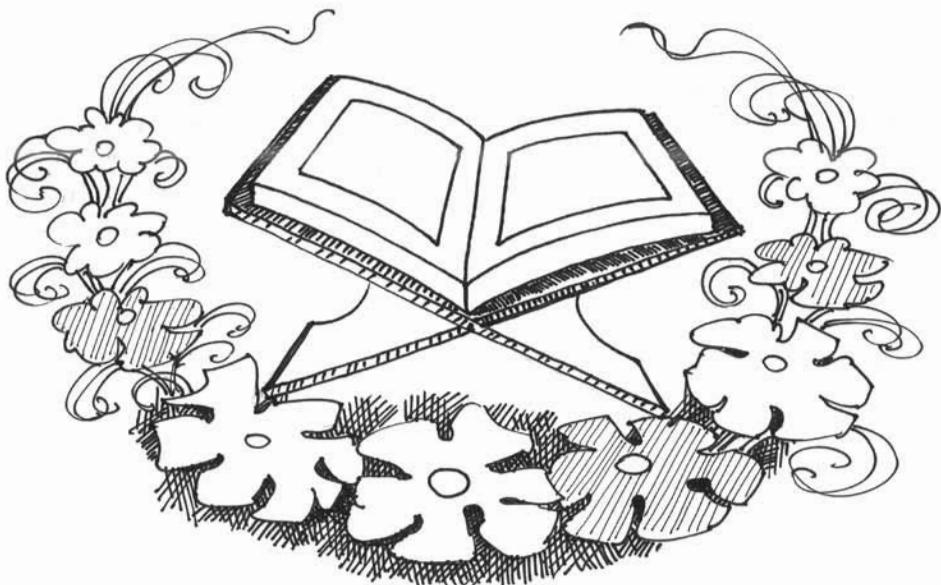
খ. ‘সংগ্রামে সাহসে প্রজ্ঞ’ দ্বারা কৌ বোঝানো হয়েছে?

গ. অমিত সাহেবের চরিত্রে ‘সাম্য’ কবিতার বৈসাদৃশ্যের দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “উদ্দীপকের মূলভাব যেন ‘সাম্য’ কবিতারই প্রতিরূপ” — বিশ্লেষণ কর।

କୋରାନେର ବାଣୀ

ସତ୍ୟସ୍ମରିତ ଦତ୍ତ



ଅଧ୍ୟାଦିନେର ଆଲୋର ଦୋହାଇ,
ନିଶାର ଦୋହାଇ ଓରେ
ପ୍ରଭୁ ତୋରେ ଛେଡ଼େ ଯାନନି କଥନୋ,
ମୃଣା ନା କରେନ ତୋରେ ।
ଅତୀତେର ଚୟେ ନିଶ୍ଚୟାଇ ଭାଲୋ
ହବେ ରେ ଭବିଷ୍ୟତ,
ଏକଦିନ ଖୁଣି ହବି ତୁଇ ଲଭି
ତାର କୃପା ସୁମହନ୍ ।
ଅସହାୟ ସବେ ଆସିଲି ଜଗତେ
ତିନି ଦିଯାହେନ ଠାଇ—
ତ୍ରକା ଓ କୁଞ୍ଚା ଦୁଃଖ ଯା ଛିଲ
ଶୁଚାଯେ ଦେହେନ ତାଇ ।
ପଥ ଭୁଲେଛିଲି ତିନିଇ ସୁପଥ
ଦେଖାଯେ ଦେହେନ ତୋରେ,
ମେ କୃପାର କଥା କରଣେ ରାଖିଲି;
ଅସହାୟ ଜନେ ଓରେ
ଦଲିସ ନା କବୁ ଡିଖାରି ଆତୁର
ବିମୁଖ ଯେନ ନା ହୟ
ତାର କରୁଣାର ବାରତା ଘୋଷଣା
କରବେ ଦୁଲିଙ୍ଗାମଯ ।

শব্দার্থ ও টীকা

মধ্য দিনের আলোর দোহাই- আরব মরুময় দেশ। সূর্যের প্রথরতা এখানে বেশি। বিশেষ করে মধ্যাহ্নে সূর্য প্রচল্প প্রথর হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে রাত্রির অন্ধকারকে সবাই ভয় পায়। তাই তৎকালীন আরবের লোকেরা কোনো কিছুর জন্য শপথ করলে মধ্য দিনের আলো ও রাত্রির দোহাই দিত।

নিশা- রাত্রি।

জাতি-লাভ করে।

কৃপা-দয়া।

সুপথ- ভালোপথ, আরবের লোকেরা পূর্বে প্রতিমা পূজা করত। তারা ছিল ভুল পথে। এই আরবদের এক বংশেই হযরত মুহাম্মদ (স.) জন্মগ্রহণ করেন।

অসহায়- মনে।

অসহায় - সহায়হীন, দরিদ্র।

দণ্ডিস না কভু- কখনো পদদলিত করিস না, অর্থাৎ জুলুম করিস না।

বিমুখ-নিরাশ।

বারতা-বার্তা, খবর।

অগভ্যময়-সারা বিশ্বে।

পাঠ-পরিচিতি

‘কোরানের বাণী’ সত্ত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি অনুবাদ কবিতা। এটি তিনি অনুবাদ করেছেন কুরআন শরিফের সুরা আদ-দোহা থেকে। সুরাটি নাযিল হয়েছিল মক্কায়। তখন বেশ কিছুকাল হযরতের নিকট ওহি নাযিল হচ্ছিল না। তাঁর দুশমনরা তাই প্রচার করতে থাকে যে, আল্লাহ মুহাম্মদ (স.) কে ভুলে গেছেন। ওহি নাযিল না হওয়ায় হযরতও চিন্তিত হয়ে পড়েন। এই সময়ই আল্লাহ রাসূলকে আশুস্ত করার জন্য মধ্য দিনের আলো ও রাত্রির দোহাই দিয়ে বলেছেন যে, তিনি তাকে ভুলেন নি। অতীতের চেয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ আরও ভালো হবে এবং তিনি আল্লাহর কৃপা লাভ করে খুশি হবেন। তিনি যখন ইয়াতীম হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন, তখন আল্লাহই তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি যখন সুপথের সন্ধান করছিলেন তখন আল্লাহ তাঁকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। সেই দয়ার কথা স্মরণ করে তিনি যেন কোনো অসহায় জনের উপর জুলুম না করেন। তিনি যেন ভিখারি-আতুরকে সাহায্য করেন এবং করুণাময় আল্লাহর দয়ার কথা সারা বিশ্বে প্রচার করেন।

লেখক-পরিচিতি

সত্ত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ‘ছন্দের যাদুকর’ হিসেবে পরিচিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হলো: সবিতা, বেনু ও বীনা, কুহ ও কেকা, বেলাশেষের গান প্রভৃতি। তিনি ১৯২২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে বলা হয়-

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| ক) ছন্দের যাদুকর | খ) আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারকারী |
| গ) গ্রাম বাংলার কবি | ঘ) মহাকবি |

২. ‘মধ্যদিনের আলোর দোহাই ওরে’-এখানে কবি দিনের আলো দ্বারা কী বুঝাতে চেয়েছেন?

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ক) দিন-রাত্রি | খ) কোনো কিছুর শপথ |
| গ) আলো অঁধারের খেলা | ঘ) রাত্রির কথা |

স্তবকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

অসহায় যবে আসিলি জগতে

তিনি দিয়াছেন-ঠাই-

ত্রঞ্চ ও ক্ষুধা দুঃখ যা ছিল

ঘূঢ়ায়ে দেছেন তাই

পথ ভুলেছিলি তিনিই সুপথ

দেখায়ে দেছেন তোরে

সে কৃপার কথা স্মরণে রাখিস;

অসহায় জনে ওরে

৩. উল্লিখিত স্তবকে কোন মহামানবের আগমনের কথা বলা হয়েছে?

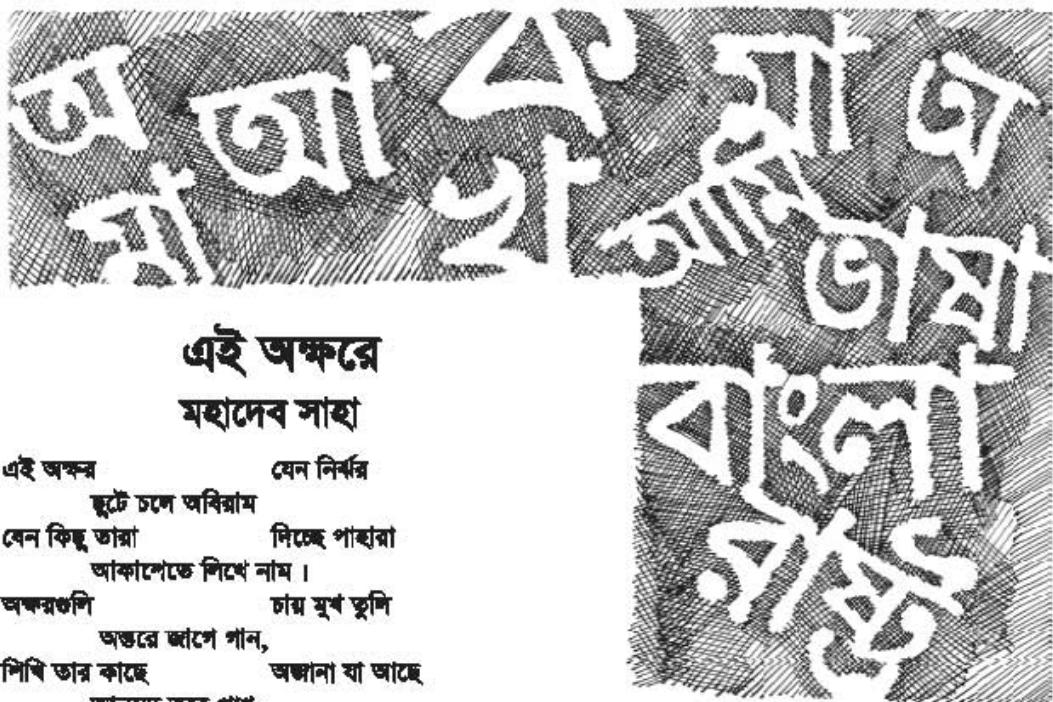
- হ্যরত মুহাম্মদ (স.)
- হ্যরত আদম (আ.)
- হ্যরত মুহাম্মদ (স.) ও হ্যরত আদম (আ.)

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ১২ই রবিউল আউয়াল টাঁদে মিলাদুল্লাহী উপলক্ষে মসজিদে জনৈক ইমাম সাহেব বললেন, আল্লাহর
রাসূল এমন সময় জন্মগ্রহণ করেন যখন আরব জাহানে অত্যাচার, নির্যাতনে মানুষ অসহায় হয়ে পড়ছিল।
দরিদ্র ইয়াতীম ও নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কেউ এগিয়ে আসে নি। এই সময়ে রাসূল (স.)
কয়েকজন যুবকদের নিয়ে হিলফ উল ফুয়ুল গঠন করেন এবং অসহায় নির্যাতিত মানুষকে সহায়তা দান
করেন, এছাড়া ঝগড়া বিবাদ মীমাংসা করার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন।
- ক. ‘কোরানের বাণী’ কোন সুরার অনুবাদ?
 খ. কোন পটভূমিতে এই সুরাটি নাযিল হয়?
 গ. ‘অসহায় যবে আসিলি জগতে
 তিনি দিয়াছেন ঠাঁই’ — উদ্দীপকের সাথে এই উক্তিটির সাদৃশ্য দেখাও।
 ঘ. ইমাম সাহেবের কথাগুলো ‘কোরানের বাণী’ কবিতার মূল বক্তব্যের সাথে মিলে যায়—বিশ্লেষণ কর।



**ଏହି ଅକ୍ଷରେ
ଯହାଦେବ ସାହା**

ଏହି ଅକ୍ଷର	ଯେଣ ନିର୍ବିର
ଛୁଟେ ଚଳେ ଅବିରାମ	
ଯେଳ କିଛୁ ତାଙ୍ଗୀ	ଦିଜେ ପାହରା
ଆକାଶେତେ ଲିଖେ ନାମ ।	
ଅକ୍ଷରଭଣୀ	ତାମ ମୁଖ ଝୁଲି
ଅକ୍ଷରେ ଜାଗେ ଗାନ,	
ଶିଥି ତାର କାହେ	ଅଜାନା ଯା ଆହେ
ଆନମ୍ବେ ଭବେ ଥୋଣ;	

ଏହି ଅକ୍ଷରେ	ଯାକେ ଯନେ ପଡ଼େ
ମନ ହରେ ବାର ନମୀ,	
ଆର କିଛୁ ତାଇ	ପାଇ ବା ନା ପାଇ
ଚିଠିଖାନା ପାଇ ବନି ।	
ସେଇ ଉପରୀଯ	ମନ ଭବେ ଯାଇ
ଦେବି ଅପରୂପ ଛବି —	
ସକାଳ ଦୂର୍ଗୁର	ସୁରେର ନୃପୁର
ବାଜାର ଉଦ୍‌ଦାସ କବି ।	

ଏହି ଅକ୍ଷରେ	ଡାକ ନାମ ଥରେ
ଡାକ ଦେଇ ବୁଝି କେଉଁ,	
ବନ୍ଦେର ମତୋ	ବୁଝିବା ଯତୋ
ଅକ୍ଷରେ ତୋଳେ ଢେଡ଼ ।	

ଏହି ଅକ୍ଷର	ଆଜୀର-ଗର
ସକଳେରେ କାହେ ଟାଳେ,	
ଏହି ପିର ଭାବା	ବୁଝି ଦେଇ ଆଶା
ବିଯୋହିତ କରେ ଶାନେ ।	

ଏହି ଅକ୍ଷର	କଟିମ ପାଥରେ
ଶିଳାଶିଲି ଦେଖା ହୁଏ,	
ଏହି ଭାବା ଦିରେ	ଗାନ ଲିଖେ ନିରେ
ମୁକ୍ତ କରେଇ ଜଗ ।	

শব্দার্থ ও টীকা

- অক্ষর - অক্ষর বলতে এখানে বর্ণ এবং বৃহৎ অর্থে মাতৃভাষা বোঝানো হয়েছে।
- নির্বর - করন।
- ‘এই অক্ষর যেন - আমরা আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলি, লিখি। আমাদের পূর্বপুরুষেরাও তাই করতেন।
- নির্বর ছুটে চলে অবিরাম’ - তাই বলা হয়েছে মাতৃভাষা অবিরাম ছুটে চলেছে। মানে মাতৃভাষার মাধ্যমে আমরা নানা কাজ করে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছি।
- ‘যেন কিছু তারা - এক সময়ে আমাদের এই দেশ পরায়ীন ছিল। শাসকেরা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করার সুযোগ থেকে আমাদের বৃদ্ধিত করেছিল। কিন্তু তখনকার সচেতন বাঙালিরা এ অধিকার আদায় করে নেয়। সে অধিকার আদায় করার জন্য অক্ষরগুলো যেন নিরবাছুন্নভাবে অনুপ্রেরণার বিষয় হয়ে আছে।
- ‘এই অক্ষরে মাকে - মায়ের কাছ থেকেই আমরা মাতৃভাষা প্রথম শিখি। তাই অক্ষর বা ভাষার দৃষ্টান্ত দেখলেই মাকে মনে পড়ে যায়।
- উপমা - তুলনা।
- অপরূপ - খুব সুন্দর।
- নৃপুর - পায়ে পরার অলংকার।
- বৃপকথা - রাজা-বাদশা, রাজপুত-রাজকন্যা, দৈত্য-দানো, রাক্ষস-খোক্ষস প্রভৃতি কাহিনি নিয়ে কাল্পনিক গল্পকে বলে বৃপকথা।
- শিলালিপি - পাথরে খোদাই করা লেখা, অনেক দিন স্থায়ী করে রাখার জন্য লেখা পাথরে বা তামার পাতে লিখে রাখা হতো। এরকম পাথরের ওপর লেখাকে বা ঐ পাথরের খণ্ডিকে বলা হয় শিলালিপি।
- ‘এই ভাষা দিয়ে - এ কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মাতৃভাষার মাধ্যমেই বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামীদের উন্মুক্ত করা হয়েছে। তাই কবি বলেছেন যে এই ভাষা দিয়ে আমরা লিখেছি মুক্তির গান। আর সেই গান মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ জুগিয়েছে। সুতরাং মাতৃভাষা ও মাতৃভাষার জন্য আদোলন থেকে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা।

পাঠের উদ্দেশ্য

মাতৃভাষার প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধা ও মমত্বোধ জাগ্রত করা।

পাঠ-পরিচিতি

বাংলা অক্ষর বা বর্ণ বাঙালি জাতির অনন্য সম্পদ। এই বর্ণমালা বাঙালির প্রাণের সঙ্গে অন্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে। বাংলা অক্ষর বাঙালির চিন্তকে আনন্দে ভরে দেয়। বাঙালিকে করে তোলে স্বপ্নমুখী। বাংলা অক্ষর বাঙালির চোখে দেখা দেয় মায়ের বৃপ্ত ধরে। কখনো তার চিন্তে বাজায় সুরের নৃপুর।

বাংলা অক্ষর বাঙালির মিলিত সন্তার শ্রেষ্ঠতম উৎস। আমাদের অক্ষরসমূহ আগন-পর সকলকে কাছে টানে, দূর করে দেয় সব বিভেদ। বাংলা অক্ষর বাঙালির বুকে সঞ্চার করে অবারিত আশা। আলোচ্য কবিতাটিতে বাংলা অক্ষর তথা বর্ণমালার প্রতি কবির অবারিত ভালোবাসা ও গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে।

লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কবি মহাদেব সাহা। তিনি ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে সিরাজগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। মহাদেব সাহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো: ‘এই গৃহ এই সন্ধ্যাস’, ‘অস্ত্রিত কালের গৌরব’, ‘টাপুর টুপুর মেঘের দুপুর’, ‘ছবি আঁকা পাথির পাখা’, ‘সরমে ফুলের নদী’ ইত্যাদি।

କର୍ମ-ଅନୁଶୀଳନ

- ক. তোমার পূর্বে পড়া বাংলা ভাষা বিষয়ক একটি গল্প বা কবিতা অবলম্বনে একটি রচনা তৈরি কর (একক কাজ)।
 খ. ভাষা-আন্দোলন নিয়ে রচিত কবিতাসমূহ সংগ্রহ করে একটি দেয়ালিকা প্রকাশ কর (দলীয় কাজ)।

ନୟନା ପ୍ରକ୍ଳମ

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i | খ. | ii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

କବିତାଂଶ୍ଟି ପଡ଼େ ୩ ଓ ୪ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦାଓ :

ନିଚେର କ୍ରୋନଟି ସଠିକ ?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আর তাই তো কখনো আমি পড়তে দিই নি ধুলো, এই কালো
এ-কারে আ-কারে
তারা যেন ক্ষেতের সোনালি পাকা ধান, থোকা থোকা
পড়ে থাকা জঁই।
তোমার জন্য জয় করেছি একটি যুদ্ধ
একটি দেশের স্বার্থীনতা।
- ক. কঠিন পাথরে কী লেখা হয়?
খ. ‘এই অক্ষরে – মাকে মনে পড়ে’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? – ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের ‘তারা’–‘এই অক্ষরে’ কবিতার কিসের সাথে তুলনীয়? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের শেষ দৃটি চরণে ‘এই অক্ষরে’ কবিতার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবার্থ ফুটে উঠেছে। – উক্তিটির
যথার্থতা নিরূপণ কর।



দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে
— মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

অহংকার পতনের মূল

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য 'ওগু' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টেল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য